জল, জঙ্গল ও জনজীবনে সুন্দরবন

জল, জঙ্গল ও জনজীবনে
সুন্দরবন

শচীন দাশ

দীপ প্রকাশন □ ৬এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

Jal, Jangal, O Janajibancy Sundarban

By

Sachin Das

প্রকাশক

শংকর মণ্ডল

২০৯ এ, বিধান সরণী

কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রথম সংস্করণ □ জানুয়ারি ১৯৯৭

মুদ্রক :

লক্ষ্মীনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

২০৯এ বিধান সরণি

কলকাতা-৬

অক্ষর বিন্যাস :

আই. ই . আর. ই

২০৯এ বিধান সরণি

কলকাতা-৬

ভূমিকা

পৃথিবীব অন্যান্য দেশের মানুষ, যারা পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে সামান্যই জানে, তারাও জানে দুটো জায়গার নাম কোলকাতা এবং সুন্দরবন। সুন্দরবন অবশ্য শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, দুই বাংলায়। সুন্দববন বাঘের— যাকে বলা হয় বয়াল বেঙ্গল টাইগার, যার উপস্থিতি, আওয়াজ এবং বক্তেব বিন্যাস সত্যিসত্যি বাজকীয়। কিন্তু শুধু বাঘ নয়, বাঘ আর মানুষ। প্রাণীজগতেব এই দুই বড় প্রাণীব সহাবস্থান সব সময় শান্তিপূর্ণ নয়। ভয়, অবিশ্বাস, ভক্তি, খানিকটা শ্রদ্ধা সব মিলিয়েই সম্পর্ক।

সুন্দববনে বাঘ আব মানুষ। ঠিক একইভাবে মিশেছে জল আর স্থল, সমুদ্র আর জঙ্গল। দক্ষিণপূর্ব অংশের এই দ্বীপময় সৌন্দর্য্যের একটা অন্য জাত আছে। এই নোনা জল ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে এক বিশেষ ধরনের 'ম্যানগ্রোভ', যা সমুদ্রকে খানিকটা ঠেকিয়ে রাখছে। সমুদ্র নানা দিক থেকে ঢুকবার চেষ্টা কবছে, আর মানুষ চেষ্টা করছে সেই অনুপ্রবেশ ঠেকাতে।

যাবা ছোট নৌকা নিয়ে সরু জলপথে জঙ্গলে ঢুকেছেন তারা এই অভিজ্ঞতা ভুলবেন না, যাবা কাঠ কাটতে যায়, মৌ সংগ্রহ করতে যায়, তাবা যায় জীবন হাতে নিয়ে। অনেকে ফিরে আসে না— তবু মানুষের যাওয়া বন্ধ হয় না। তারা নৌকো নিয়ে সমুদ্রে যায় মাছ ধরতে। ঝড় ঝঞ্ঝা তাদের চিব সঙ্গী— তবু ভয় পায় না মানুষগুলো সীমাহীন জলে ভেসে দিনেব পর দিন মাছ ধবতে। নদীতে 'কামোট' আছে যাব দাঁত হাঙবের মতো, আবার 'শুশুক' আছে যা ডলফিন গোত্রীয়। এক সময় কুমীর ছিল প্রচুর। এখন তার সংখ্যা কমে এসেছে। প্রকৃতি আব মানুষের দ্বন্দ্ব চলছে আবার প্রকৃতিকে মানিয়ে নেবার চেষ্টাও করছে মানুষ, নৌকো দিয়ে নদীপথে এসে জঙ্গল কেটে উপনিবেশ তৈরি করেছে মানুষ। বাঘ, কুমীর, কামোট, বা এ ছাড়াও মাটি উর্বর নয়; মিষ্টি জল পাওয়া শক্ত, তবু চাষের কাজ বন্ধ হয়নি।

শ্রী শচীন দাশের এই মনোরম আলেখ্য ফুটিয়ে তুলেছে সুন্দরবনের মানুষ ও প্রকৃতিকে, তাদেব দ্বন্দ্বকে, তাদেব জীবনকে। সঙ্গে আছে ইতিহাস থেকে লোকগাঁথা মানুষের বিশ্বাস আর কুসংস্কারের প্রসঙ্গ। যাবা সুন্দরবনকে জানতে চান তাদের কাছে অবশ্য পাঠ্য এই পুস্তক। শচীনবাবুকে ধন্যবাদ এই সুন্দর গ্রন্থটি আমাদের উপহার দেবার জন্য।

বিপ্লব দাশগুপ্ত
সাংসদ, রাজ্যসভা

গ্রন্থ-প্রসঙ্গে

কী ভাবে শুরু করা উচিত জানি না— তবে বছর কুড়ি ধরে কর্মসূত্রে বিভিন্ন সময়ে সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের এই বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ সম্পর্কে প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধ করেছি। আর সেই থেকেই ভাবনাটা মাথায় ঘুরছিল। কেননা ততদিনে এ-অঞ্চল নিয়ে অন্তত গোটা তিরিশেক গল্প ও একটি উপন্যাস লিখে ফেলেছি এবং পাশাপাশি জানতে চেষ্টা করেছি গোটা দক্ষিণবঙ্গ তথা এই অঞ্চল সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যাদি। ফলে নিবিড় হয়ে উঠছিল ক্রমশ এই অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্ক। মনে মনে তখন থেকেই এরপর তৈরি হচ্ছিলাম। লেখাও এগোচ্ছিল। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের মুখপত্র 'সেচপত্র' প্রকাশ পায় এবং ঐ পত্রেই প্রথম লিখতে শুরু করি সুন্দরবন সম্পর্কিত এই রচনা। নামও দিয়েছিলাম 'জল, জঙ্গল ও জনজীবনে সুন্দরবন'। এই নামই বইয়ে রেখে দেওয়া হল উপযুক্ত মনে হওয়ায়। তবুও এই রচনা পরিপূর্ণ বলা চলবে না — যেহেতু এখনও অনেক কিছুই বাকি রয়ে গেল লিখতে। কাজেই সেদিক থেকে এটি একটি ভূমিকা মাত্র। পরে ইচ্ছে রইল আরও বিস্তারিত কাজের। পারি ভালো, না হয় অন্য কেউ না কেউ নিশ্চয়ই করবেন — এ বিশ্বাস আছে।

শচীন দাশ

দ্বীপের সেই মানুষটি — আকাশ দেখে যে আগাম বলে, কবে বৃষ্টি আসবে; মাটি দেখে যে জানায়, ওই মাটিতে কী ধান ভালো হবে এবং যাকে নিয়ে আমার 'সোলেমানের ডিঙা' গল্পটি — সেই তার জন্য

সূচী □

সূচী □

চিত্র সূচী □

সীমানা, ভূ-তত্ত্ব ও প্রাচীন ইতিহাস

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে নবকুমারের মুখে কবি কালিদাসের 'রঘুবংশ' থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

"দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে-
র্দ্বারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা।।"

বঙ্কিমচন্দ্র উদ্ধৃত ওই বনরাজি নীলাই হল সুন্দরবন। তবে এই চিত্র আজকের নয়, প্রাচীন সুন্দরবনের। আর তার রূপ এতই বিচিত্র ও মনোমুগ্ধকর যে গঙ্গাসাগর থেকে ফেরার সময় সে রূপে মুগ্ধ নবকুমার তাঁর উচ্ছ্বাস চেপে রাখতে পারেননি। সহযাত্রীর সামনেই মুখ থেকে তাই বেরিয়ে এসেছিল ওই বর্ণনা।

তা এই বর্ণনা যে সত্যি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। একদিকে সমুদ্র, শ্বাপদসংকুল অরণ্য, অন্যদিকে মানবদেহের শিরা-উপশিরার মতো ছোট-বড় অসংখ্য নদনদী, সমুদ্র অভিমুখী বয়ে চলেছে। "নিম্নবঙ্গে যেখানে গঙ্গা বহু শাখা বিস্তার করিয়া সাগরে আত্মবিসর্জন করিয়াছে, প্রাচীন বঙ্গের দক্ষিণাংশে অবস্থিত সেই লবণাক্ত পল্ললময় অসংখ্য বৃক্ষ-গুল্ম সমাচ্ছাদিত শ্বাপদসংকুল চরভাগ সুন্দরবন বলিয়া পরিকীর্তিত হয়।" আসলে পশ্চিমে ভাগীরথীর মোহনা থেকে পূর্বে মেঘনা নদীর মোহনা পর্যন্ত এই সুন্দরবন বিস্তৃত। কিন্তু, এ ভৌগোলিক চিত্রও অবিভক্ত বাংলার সুন্দরবনের। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর এ ছবিও আবার অনেকটা পালটে যায়। সুন্দরবনের অধিকাংশ জায়গাই চলে যায় সে-সময়ের পূর্ব পাকিস্তানের [বর্তমান বাংলাদেশ] ভেতরে। অর্থাৎ সমগ্র সুন্দরবনের ২.০৭ মিলিয়ন হেক্টর বা ৮০০০ বর্গমাইল অঞ্চলের মধ্যে শতকরা মাত্র ৩৮.৫৪ ভাগ বা ০.৭৯১ মিলিয়ন [৩০৮৯ বর্গমাইল] হেক্টর অঞ্চল স্বাধীন ভারতের বিভক্ত বাংলার সুন্দরবন, এবং এই ভৌগোলিক আয়তনের ভেতরে ১৬২৯ বর্গমাইল অঞ্চল নদীনালা ও খাঁড়িসহ সংরক্ষিত বনাঞ্চল, ১০০০ বর্গমাইল কৃষিযোগ্য জমি—আর একে ঘিরেই রয়েছে ৩৫০০ কিলোমিটার প্রান্তীয় বাঁধ; বাকি ৪৬০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে রয়েছে জলের উপরিতল, জোয়ার ও ভাঁটা রেখার মধ্যবর্তীস্থান ও নতুন নতুন কিছু চর অঞ্চল।

ভূ-তাত্ত্বিক বিচারে বর্তমান সুন্দরবনের জন্ম কিন্তু বেশিদিনের নয়। দুই বা

তিন হাজার বছর আগে এখনকার সুন্দরবনের বেশিরভাগ অঞ্চলই ছিল সমুদ্রগর্ভে। তার আগে অবশ্য ভূ-পৃষ্ঠ অপেক্ষা অনেক উঁচুতে ছিল পুরনো এক সুন্দরবন। কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠের অবনমনের ফলে সে প্রাচীন বনাঞ্চল সমুদ্রগর্ভে বিলুপ্ত হয়ে যায়। আবার তার উত্থান ঘটে বেশ কয়েক হাজার বছর পরে। আসলে ভূ-পৃষ্ঠের নিমজ্জন বা বারংবার অবনমনের ফলে দক্ষিণাংশের এই বিশাল অঞ্চল কখনও বিলুপ্ত হয়েছে, আবারও কখনও সে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। বেশিদিনের কথা নয়, সাড়ে তিনশো বছর আগে, ১৭৩৭ সালেও এ অঞ্চলে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে জলের উচ্চতা প্রায় ৪০ ফুট পর্যন্ত উঠেছিল ভয়ঙ্কর এক সামুদ্রিক ঝড়ের প্রকোপে। আর তাতে হাজার হাজার মানুষজন ও গবাদি পশু মারা যায়। ধ্বংস হয়ে যায় সুন্দর এক জনপদ। কিন্তু ধ্বংসের মধ্যেই থাকে সৃষ্টির বীজ। ফলে যে জনপদ হল ধ্বংস, যে বনাঞ্চল গেল হারিয়ে, সৃষ্টির অমোঘ প্রক্রিয়ায় হাজার হাজার বছর পরে সে ধ্বংসাবশেষ থেকেই হয়তো জন্ম নিল নতুন এক ভূমিখণ্ড বা নয়াবসত। বাংলার দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চলের এ প্রক্রিয়া বারে বারেই ঘটেছে।

আসলে সুন্দরবন হল এক বিশাল গাঙ্গেয় **ব-দ্বীপ বা** Gangetic Delta। ডেলটা হল অক্ষর। গ্রিক বর্ণমালার চতুর্থ অক্ষর; আর একে দেখতে ঠিক ত্রিভুজের মতো। এ রকমই ত্রিভুজাকৃতি বলে সুন্দরবনের এই দ্বীপগুলিকে ডেলটা বা ব-দ্বীপ বলা হয়। এই ব-দ্বীপ খুবই প্রাচীন। কেননা মহাভারত থেকে শুরু করে কয়েকটি পুরাণ ও রঘুবংশে এই ব-দ্বীপের উল্লেখ আছে।

বঙ্গদেশে সবার আগে অনার্য জাতির বসবাস ছিল। ইতিহাসে পাওয়া যায়, কোনও এক অজ্ঞাত অতীতে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ-এর সর্বত্রই অতল সমুদ্র ছিল। আর গঙ্গা নদীতে হিমালয় থেকে জল প্রবাহিত হয়ে যুগ যুগ ধরে চর ও দ্বীপ গঠিত হয়েছে। গঙ্গার শাখা পদ্মা ও ভাগীরথীর মধ্যভাগই এই গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ এবং এরই পরের নাম হয়েছিল বাগড়ি। তার আগে এই স্থান বঙ্গের অধীনে ছিল।

ব-দ্বীপ গঠনের পর সম্ভবত আদিম যুগের লোকেরা ও অনার্যগণ বিভিন্ন দিক থেকে এসে এইসব অঞ্চল আবাদ করে বসবাস করতে শুরু করে। কিন্তু কত হাজার আগে এই বসতি গড়ে উঠেছিল তা ইতিহাসে ঠিক পাওয়া যায়নি।

গঙ্গা ও পদ্মার সঙ্গমস্থলে প্রাচীনকালে অনেক দ্বীপের উৎপত্তি হয়েছিল। ক্রমে ভাগীরথীর পূর্বে ও পদ্মার দক্ষিণ দিকে চর ও দ্বীপের সৃষ্টি হতে থাকে। হিমালয়ের বরফ গলা জলরাশি পর্বতরেণু বহন করে সাগরের দিকে ছুটতে থাকে এবং বালি ও মাটির সমন্বয়ে একরকম পলি মাটি নদীর তীরবর্তী প্রদেশ উঁচু করে চলে যায়। এভাবে পদ্মা ও ভাগীরথীর মধ্যবর্তীস্থান দ্বীপ রূপে গঠিত হয়ে কোথায়ও জঙ্গলাকীর্ণ, কোথায়ও বসতিযোগ্য হয়ে ত্রিকোণাকৃতি ভূমিখণ্ড আসমুদ্র বিস্তারিত হয়ে পড়ে। একেই প্রাচীনকালে **বক্ দ্বীপ** বা পরবর্তীকালে

আজকের সুন্দরবন : মাছ ধরার প্রস্তুতি চলছে জেলেদের

ব-দ্বীপ বলা হয়। এই বক্ দ্বীপই বৌদ্ধ আমলে বগ্‌দি এবং সেন রাজত্বে বাগ্‌দি বা বাগড়ি নামে পরিচিত হয়। ক্যানিংহাম এর কথায়, গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ-এর নাম ছিল ব্যাঘ্রতটি। এখানকার জঙ্গলময় স্থানে বাঘের উপদ্রব ছিল খুব বেশি। সেজন্য গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপকে ব্যাঘ্রতটি বলা হত। সেন রাজাদের আমলে এই ব্যাঘ্রতটি বাগ্‌ড়ি বা বাগ্‌দি নামে পরিচিত হয়।

গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের আকৃতি আগে এত বিস্তৃত ও প্রশস্ত ছিল না। "পাণিনির মহাভাষ্য পতঞ্জলি প্রাচীন আর্যাবর্তের সীমা নির্দেশ করিতে গিয়া উহার পূর্বভাগে কালকবনের উল্লেখ করিয়াছেন। এই কালকবনই বোধহয় সুন্দরবন।"[১]

প্রাচীন ইতিহাসবিদদের মতে সুন্দরবনের আর এক নাম 'গঙ্গারিডি'। গ্রিক দূত মেঘাস্থেনিসের বিবরণে এই 'গঙ্গারিডি' রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। টলেমিও তাঁর ভৌগলিক বর্ণনায় ভাগীরথীর পূর্বতীরে দক্ষিণবঙ্গীয় এই রাজ্যের কথা বলেছেন। মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে যেমন গ্রিকদূত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে বহু মূল্যবান তথ্য লিখেছেন, তেমনই হর্ষবর্ধনের সময়েও এসেছিলেন চীনা পরিব্রাজক হিউয়েনসাঙ। তিনিও ভারতবর্ষের নানা জায়গা ঘুরে যে বিবরণ লিখেছেন তাতেও এই 'গঙ্গারিডি'-র উল্লেখ পাওয়া যায়। সে সময়ে 'গঙ্গারিডি' রাজ্য কজঙ্গল, পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণ সুবর্ণ, তাম্রলিপ্ত ও সমতট নামে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত ছিল। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ সুন্দরবন ছিল এই সমতট অংশে। অর্থাৎ যে তট বা তীরভূমি ছিল সমুদ্র বেলাভূমির সমান।

হিউয়েন সাঙ এসেছিলেন সাতের দশকে এবং তাঁর লেখায় তখনকার বঙ্গের নিম্নভূমির [সুন্দরবন] যে পরিচয় পাওয়া যায় তা হল, সমুদ্র উপকূলের নিম্নভূমি উচ্চমানের শস্য ও ফলেফুলে সমৃদ্ধ ছিল। দেশটিতে প্রবাহিত হত হালকা জলবায়ু। এখানকার অধিবাসীরা বেঁটে, গায়ের রঙ তাদের কালো ও তারা ভীষণ পরিশ্রমী। কিন্তু হিউয়েন সাঙের লেখায় গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। কেননা সে সময়ে ওই অঞ্চল অতল সমুদ্রের একাংশ ছিল। ঋগ্বেদের আমলে বঙ্গের অধিকাংশ জায়গাই ছিল সমুদ্রের বুকে। সমুদ্রের নোনাজল প্রতিরোধের জন্য তখন বহু নগরের চারদিকে বাঁধের ব্যবস্থা ছিল। হিউয়েন সাঙের বর্ণনায়ই পাওয়া যায়, সমতট ও কামরূপের মধ্যাঞ্চলে তিনি হাজার ক্রোশব্যাপী এক হ্রদ লক্ষ করেছিলেন। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে চৈতন্য দেব তাঁর পাঁচ সঙ্গী— নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ ও ব্রহ্মানন্দকে নিয়ে পুরী ধামে যাওয়ার সময় নৌকাযোগে সুন্দরবনের জলপথ অতিক্রম করেছিলেন। কিন্তু গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ বলা হয় কেন?

১. বাংলার পুরাবৃত্ত :
পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বস্তুত, এ উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ নদী গঙ্গা, অসংখ্য পর্বতরেণুসহ হিমালয়ের তুষার নিঃসৃত জলরাশি বহন করে অনবরত সমুদ্রের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং তার পলি দ্বারা নতুন নতুন ভূমি গঠন করছে। আবার একসময় গঙ্গা ও তার শাখা নদীসমূহ পলিমাটি বহন করে পার্শ্ববর্তী ভূমি গঠন করতে করতে সুদূর দক্ষিণে সাগরের বুকেও মিশে যাচ্ছে। এভাবে যুগে যুগে গঙ্গা তার শাখা-প্রশাখা দ্বারা দু'বাহুর মধ্যবর্তী ত্রিকোণ ভূ-ভাগ গড়ে তুলেছে। গঙ্গা দ্বারা সৃষ্টি বলেই এই ভূ-ভাগকে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ নামে অভিহিত করা হয়।

ব-দ্বীপের ধর্মই হল জলকে স্থল করা ও স্থলভাগকে উন্নত ও উর্বর করা। নদীর স্রোত প্রথমে সাগরের গর্ভে পড়ে। এই স্রোতের সঙ্গে পলিমাটিও বাহিত হয়; জল সরে গেলে একসময় ভূমি উত্থিত হয় এবং কোনও কোনও জায়গায় নদী বা নালা থেকে যায়। আর পলিমাটির দ্বারা যে সব চরভূমির সৃষ্টি হয় তাই মাদিয়া, দিয়াড়া বা দ্বীপ নামে অভিহিত হয়। এভাবেই ব-দ্বীপ তার কার্য চালাতে থাকে। আসলে মুর্শিদাবাদ ও নবদ্বীপ থেকেই এই ব-দ্বীপের গঠন শুরু হয়েছিল একসময়। আর দক্ষিণে, গঙ্গা ভাগীরথী নাম নিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়ার আগে অসংখ্য ব-দ্বীপ সৃষ্টি করেছে। এ সব ব-দ্বীপগুলিতে একসময় জঙ্গলও ছিল ভয়ঙ্কর। সমুদ্রাভিমুখী ব-দ্বীপগুলিতে জঙ্গলের ঘনত্ব ছিল আরও বেশি। আস্তে আস্তে জঙ্গল অপসারিত হতে থাকে এবং সে সব জায়গায় মনুষ্য বসতিও গড়ে ওঠে। আর এই জঙ্গল অপসারণের কাজ শুরু হয় মূলত এ দেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আগমনের পর।

ইংরেজি ১৬১০ সাল ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বছর। ওই বছরই সুরাটের বন্দরে এসে নেমেছিলেন ক্যাপ্টেন হকিন্স। ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম সফল প্রতিনিধি। কোম্পানি ইংল্যাণ্ডের রানি এলিজাবেথের কাছ থেকে ভারতে ব্যবসা করার একচেটিয়া অধিকার পেয়েছিলেন। সে অধিকারবলেই এরপর একে একে এ দেশে আসতে থাকেন কোম্পানির প্রতিনিধিরা। আর ব্যবসা করতে করতেই একদিন বণিকের মানদণ্ড ছেড়ে এ দেশে রাজদণ্ডও তুলে নিলেন হাতে। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর, বাংলার নতুন নবাব মীরজাফরের কাছ থেকে কোম্পানির তৎকালীন প্রতিনিধি লর্ড ক্লাইভ পেয়ে যান ২৪ পরগনার জমিদারি স্বত্ব। যে ২৪টি পরগনা তিনি পেয়েছিলেন সেগুলি হল: (১) আকবরপুর (২) আমিরপুর (৩) আজিমাবাদ (৪) বালিয়া (৫) বারিদহাটি (৬) বসনধারী (৭) কলিকাতা (৮) দক্ষিণ সাগর (৯) গড় (১০) হাতিগড় (১১) ইখতিয়ারপুর (১২) খরিজুরি (১৩) খাসপুর (১৪) ময়দান মল বা মেদন মল্ল (বর্তমান ক্যানিং) (১৫) মাগুরা (১৬) মানপুর (১৭) ময়দা (১৮) মুরাগাছিয়া (১৯) পাইকান (২০) পেঁচাকলি (২১) সাতল (২২) শানগর (২৩) শাপুর (২৪) উত্তর পরগনা। এই ২৪টি পরগনার

মধ্যেই ছিল সুন্দরবন এবং কোম্পানির প্রতিনিধি সাহেবদেরও তা নজরে এসেছিল; কিন্তু সরেজমিনে দেখে আসা আর হয়নি।

১৭৯০-৯১ সালে কোম্পানি প্রথম এদিকে নজর দিল। সুন্দরবনকে কৃষিযোগ্য করে তোলার জন্য টিলম্যান হেন্‌ককেল নামে এক সাহেবকে তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হল। টিলম্যান অবশ্য গিয়েছিলেন তারও আগে ১৭৮৩ সালে। তিন বছর ধরে তিনি সুন্দরবনে ঘুরে বেড়ালেন। অধিকাংশ জায়গায়ই চষে ফেললেন। আর দীর্ঘদিন ধরে ঘুরতে ঘুরতে ওই অঞ্চল সম্পর্কে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হল, তাই তিনি জানালেন তখনকার ভারতের গভর্নর জেনারেল, ওয়ারেন হেস্টিংসকে।

টিলম্যান লিখলেন, 'That it is practicable to populate these wild and extensive forests, and not a mere speculative idea, we have only to recur to the terms of the Mogul Government, and we shall find, that prior to the invasion of the Mugs in the Bengal year 1128, these lands were in the finest state of cultivation and the villages in general well populated. The number of Mosques and other places of worship still remaining fully demonstrate its formen splender and magnificence.''[২] সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও আবার জানালেন, সেই সুস্থ জনজীবন ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পেছনে ছিল মগদস্যুদের লুঠপাট ও ভয়ঙ্কর অত্যাচার।

টিলম্যান সাহেবের এ কথা পুরোপুরি না হলেও আংশিক সত্যি। আসলে মগদস্যুদের বারবার লুঠপাট ছাড়াও ওই সভ্যতা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পেছনে ছিল আরও অনেক নানাবিধ কারণ। সেসব কারণ নিয়ে পরে অবশ্য বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া যাবে, কিন্তু তার আগে বলা দরকার—সুন্দরবন নামের উৎস কোথায়! কোথা থেকে এল এই নামটি!

---

২. THE CALCUTTA REVIEW, 1858, Vol. X X XI, pp. 385-411

২

নামের উৎস, সংস্কার ও উন্নয়ন

বিশাল এই গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ সুন্দরবনের নাম নিয়ে অবশ্য নানান মুনির নানান মত আছে। কেউ কেউ বলেন, সুন্দরবন নামটি এসেছে দুটি হিন্দি শব্দ থেকে। বাংলায় যার একটি অর্থ 'সুন্দর' এবং অন্যটি 'অরণ্য' বা বন। অর্থাৎ সুন্দর অরণ্য থেকেই 'সুন্দরবন'। আবার কেউ কেউ মনে করেন, সুন্দরবন নামটি এসেছে 'সুন্দরী' বৃক্ষ থেকে। এই বৃক্ষটির জন্মহার এ অঞ্চলের কোনও জায়গায় একটু বেশিই। তাই সুন্দরী বৃক্ষের অরণ্য বা সুন্দরী বন থেকেই 'সুন্দরবন'। কিন্তু এ অভিমতটি অনেকেই গ্রহণ করেননি। এঁদের মধ্যে একজন অবশ্যই FREDERICK EDEN PARGITAR। তিনি তাঁর 'A REVENUE HISTORY OF THE SUNDARBANS [from 1765 to 1870]' লিখতে গিয়ে এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, সুন্দরী বৃক্ষ থেকে যে সুন্দরবন হয়নি তার কারণ, এ অঞ্চলে সুন্দরী ছাড়াও অন্যান্য বৃক্ষের প্রাধান্য ছিল। এদের মধ্যে গরাণ, গর্জন, পশুর, হেঁতাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাহলে শুধুমাত্র নামের জন্য সুন্দরী গাছকে বেছে নেওয়া হবে কেন? অন্যান্য গাছও তো ছিল; তাছাড়া আরও একট ব্যাপার, চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণ অংশে তো সুন্দরী গাছই নেই, তবুও তো সে সব অঞ্চলের নাম সুন্দরবন। তাহলে এই গাছের নাম অনুসারে যে সুন্দরবন হয়নি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। পারগিটার সাহেবকে সমর্থন করে কেউ কেউ আবার বলেন, হ্যাঁ এ কথা ঠিক সুন্দরীগাছ থেকে সুন্দরবন নামকরণ হয়নি, সুন্দরবন নামটি এসেছে আসলে 'সমুদ্রবন' থেকে। সমুদ্রবন মানে, সমুদ্রতীরবর্তী মাইলের পর মাইল ধরে এই অরণ্য এত সুন্দর ছিল যে দেখেই ভাল লেগে যেত। লোকে বলত তাই 'সমুদ্রবন'। অর্থাৎ সমুদ্রধারের ওই অঞ্চল। এই সমুদ্রবনই কালক্রমে অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে 'সমুন্দরবন' হয়ে 'সুন্দরবন' হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে। আবার অনেকের মতে, এ অঞ্চলে বিশাল ওই জনপদ একসময় শাসন করতেন চন্দ্রবংশীয় রাজারা। এই রাজবংশের নাম ধরেই ওই অরণ্যের নাম হয়েছিল চন্দ্রবন। আর চন্দ্রবনই পরে 'চন্দ্রবন' হয়ে সুন্দরবনে পরিণত হয়েছে। এই সঙ্গে এ নামের ওপর ফরাসি প্রভাবও পড়েছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। কেননা ফরাসিরা যে এই অরণ্যকে 'স্যাণ্ডারবন' বলত সে তথ্যও পাওয়া যায়। আর ইংরেজদের মুখে সুন্দরবন তো 'চ্যাণ্ডারবন' হয়েই উচ্চারিত হত।

এ প্রসঙ্গে আর তথ্যও উল্লেখ করা যায়। 'HISTORY OF BAKER-GANGE'

গ্রন্থের লেখক বিভারিজ সাহেব বলেন, ওই জেলায় সুন্ধা নামের একটি নদী থেকেই সুন্দরবনের নামকরণ হয়। সুন্ধা নদীর পূর্বনাম ছিল সুগন্ধা, আর সুগন্ধার পাড়ের বনভূমিকে সুন্ধারবন বলা হত। বিভারিজ সাহেবের অনুমান, এই সুন্ধারবনই পরে হয়ে ওঠে সুন্দরবন। কিন্তু এ-তথ্যও মেনে নেওয়া মুশকিল। কেননা বাকেরগঞ্জ জেলার অখ্যাতনামা এক নদী থেকে বিশাল এই ব-দ্বীপের নাম সুন্দরবন হয়েছে, এটা একরকম অসম্ভব।

আসলে বিশাল এই ভূ-খণ্ড সুন্দরবন দেখতে সত্যিই সুন্দর। এর দিগন্ত প্রসারিণী লবণাক্ত সলিলা নদ-নদী, অসংখ্য খাড়ি ও তার দু'দিকে সারিবদ্ধ বৃক্ষশ্রেণী এক মনোরম দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। এ সমস্ত বৃক্ষ কেউ লাগায়নি, প্রকৃতির আপন খেয়ালে এরা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে জন্ম নিচ্ছে, বড় হচ্ছে ও একসময় আবার মরেও যাচ্ছে। এর পাশাপাশি আছে আবার অসংখ্য হরিণ, বরা, গো-সাপ, কুমির, হাঙর, বিষধর সাপ ও এ-অরণ্যের বিখ্যাত প্রাণী বাঘ। আছে জানা-অজানা অসংখ্য সুন্দর পাখি; আছে জঙ্গলের গভীরে নয়নাভিরাম ফুলের মেলা এবং নদীর জলে হাজারো রকমের মাছ আর কাঁকড়া। সম্ভবত এ কারণেই, সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চল জুড়ে এমন সুন্দর অরণ্য দেখেই এর নাম নিশ্চয়ই হয়েছিল সুন্দরবন। আর সে সুন্দরবনই কালে কালে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্র উঠেছে।

কিন্তু এই মতও আবার অনেকে গ্রহণ করেননি। কেননা 'সুন্দরবন' নাম খুব প্রাচীন না হলেও আধুনিক নয়। এই অঞ্চল নদীমাতৃক। এখানকার জলবায়ু আর্দ্র। সেজন্য সমুদ্র কূলবর্তী দক্ষিণ প্রদেশকে মধ্যযুগের ঐতিহাসিকেরা 'ভাটিদেশ' বলে অভিহিত করেছেন। এবং মোগল যুগের বারভূঞাদের নামানুসারে এই দেশের নাম হয়েছিল 'বারভাটি বাংলা।'

তবে পারগিটার সাহেব যাই বলুন, এ কথা সত্যি যে, সুন্দরী বৃক্ষ এ বনাঞ্চলে একদা সর্বত্রই ছিল। কেননা গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের বিভিন্ন স্থানে পুকুর কাটার সময় প্রায়ই সুন্দরী বৃক্ষের গুঁড়ি পাওয়া গেছে মাটির নিচে। বুঢ়ণ পরগনায় (বর্তমান সাতক্ষীরা) ভূ-স্তরের আঠারো ফুট নিচে সমান্তরাল ভূতলে নানা মাপের সুন্দরী গাছ কাণ্ড ও মূলসহ পাওয়া যায় পচা অবস্থা। বিদ্যাধরী, করতোয়া ও আঠার বাঁকি— এই তিনটি নদীর মিলিত স্রোত যেখানে শেষ সেই মাতলা নদীর মাথার উত্তর তীরে নব নির্মিত ক্যানিং শহরে একটি পুকুর কাটার সময়, বর্তমান বাজারের পেছনে দেখা গিয়েছিল বড় বড় সুন্দরীগাছ, দাঁড়ানো অবস্থায়। তবে আধপোড়া কয়লার মতো চেহারা। কাজেই শক্ত, ভারী ও সুন্দর এই বৃক্ষ যে সুন্দরবনে সর্বত্রই ছিল বেশি পরিমাণে তাতে সন্দেহই নেই এবং সে-কারণেই, বৃক্ষের রাজা, কাঠের রাজা সুন্দরী বৃক্ষ থেকেই এই বনাঞ্চলের নাম হয়েছে সুন্দরবন।

সংস্কার ও উন্নয়ন

সুন্দর বন। সুন্দর অরণ্য।

চারদিকে তার অসংখ্য নদনদী ও খাঁড়ি। এ সমস্ত খাঁড়ি ও নদনদীর ধার থেকেই আবার শুরু হয়েছে জঙ্গল। আর সে জঙ্গলে কতই না রকমারি গাছ। সুন্দরী, গেঁওয়া, গরাণ, বাইন, পশুর, ধুন্দুল, গর্জন ও কেওড়ার অরণ্য। মাঝেমধ্যে হেঁতালের ঝোপ। আর তারই ভেতরে জঙ্গলে হাজারো পাখি। জলে মাছ, কুমির আর কামট। ডাঙায় হিংস্র পশু ও বিষাক্ত সরীসৃপ। তবুও ভয়ংকর সুন্দর এই অরণ্য নিয়ে আজও মানুষের কৌতূহল সীমাহীন। পর্যটকদের আকর্ষণ গগনচুম্বি।

কিন্তু কবে থেকে গড়ে উঠল এই আকর্ষণ! আর এই বিশাল অরণ্যের দরজা কবে থেকেই বা খুলে গেল সভ্য দুনিয়ার কাছে!

ইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখা যায়, এই আকর্ষণ কিন্তু একদিনে গড়ে ওঠেনি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে এর সংস্কার সাধনের পর এই অরণ্য আস্তে আস্তে আজ মানুষের নজরে এসেছে। পরিচিত হয়ে উঠেছে 'সুন্দরবন' পরিচয় নিয়ে। কিন্তু কীভাবে ঘটল সেই পরিচয়, আর কবেই বা শুরু হয়েছিল এই সংস্কারসাধন।

১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধের পর, মীরজাফরের কাছ থেকে কোম্পানির প্রতিনিধি লর্ড ক্লাইভ যখন ২৪-পরগনার জমিদারি স্বত্ব লাভ করেন, তখনও কিন্তু ডায়মণ্ডহারবার এমনকি কলকাতার কয়েক মাইলের মধ্যে কোনও কৃষিযোগ্য ভূমি ছিল না। ছিল শ্বাপদসংকুল ভয়ংকর অরণ্য। কিন্তু কোম্পানি শাসনভার গ্রহণ করার পরেই, প্রকৃতপক্ষে, এ সমস্ত অরণ্য কেটে জনপদ গড়ার দিকে নজর দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য সুন্দরবনকেও সেই তালিকায় সংযোজন করা হয় এবং এ-ব্যাপারে প্রথম এগিয়ে আসেন রাসেল সাহেব। মিঃ ক্লড রাসেল। ২৪-পরগনার তৎকালীন কালেক্টর-জেনারেল। নতুন এই দায়িত্ব নিয়েই তিনি সবার আগে জঙ্গল হাসিল করে জমি উদ্ধারের চেষ্টা করেন। শুধু তাই নয়, উদ্ধার করা জমিকে কৃষিযোগ্য করে তোলার জন্য প্রথমদিকে বিনা খাজনায় এ সমস্ত জমিকে ইজাবা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। পরে অবশ্য একর পিছু দেড় টাকা হিসেবে নামমাত্র একটা মূল্য ধরা হয়। কিন্তু প্রতিবেশী জমিদার ও ইজারাদারদের কাছ থেকে তেমন সাড়া পাননি। কিন্তু জঙ্গল হাসিলের কাজ থেমে থাকেনি। আর পরবর্তী প্রায় চল্লিশ বছর ধরে এই হাসিলের কাজ চালিয়ে দক্ষিণে প্রায় সাগরদ্বীপ এবং পূর্বে ক্যানিং বন্দর পর্যন্ত এই জঙ্গল-হাসিল পর্ব চলে।

তবে রাসেল সাহেবের পর এ ব্যাপারে যাঁর সবচেয়ে উদ্যোগ ছিল তিনি টিলম্যান হেনককেল, যাঁর কথা আগেও বলা হয়েছে। টিলম্যান ছিলেন (১৭৮৩) সালে যশোর জেলার জজ এবং ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর এলাকায় ছিল সুন্দরবনের এক বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ। বর্তমান বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ অঞ্চল থেকেই তিনি প্রথম তাঁর সংস্কার-পর্ব শুরু করেন। হেনককেলের পরিকল্পনা ছিল, জঙ্গল

হাসিল করে উদ্ধার করা জমিকে ছোট ছোট প্লটে ভাগ করে রায়তদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া— যাতে প্রত্যক্ষভাবে সরকারের অধীনে কৃষকদের স্বাধীন সম্পত্তি গড়ে তোলা যায় এবং এ ব্যাপারে রাসেল সাহেবের মতোই সামান্য শর্ত ছিল তাঁর। হেনককেলের এই প্রস্তাব তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস অনুমোদন করেন। এই সময় হেনককেল আরও একটি কাজে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তিনি ওই অঞ্চলের, সুন্দরবন অরণ্যের মোটামুটিভাবে একটা সীমা নির্ধারণের চেষ্টা করেন এবং পরে ১৭৮৫ সালের মধ্যে ১৫০ জন ইজারাদারকে জমি বণ্টন করেন। শুধু বণ্টন করেই থেমে থাকেননি হেনককেল; রীতিমতো চাষাবাসের জন্য উৎসাহ দিতেন ইজারাদারদের। কেননা টিলম্যান দেখেছিলেন, কলকাতার লোকসংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। অথচ এই বাড়ন্ত লোকের জন্য চাল তত বাড়ন্ত নয়। সে সময়ে পূর্ববঙ্গের জেলাগুলি থেকে বিশেষ করে বরিশাল ও বাকেরগঞ্জ থেকে তখন চাল আসত। আর এই চাল আসত জলপথে। সমগ্র সুন্দরবন ঘুরে। কিন্তু ওই ঘুরন্ত পথে, নদীর ওপর দিয়ে আসতে সময় যেমন বেশি লাগত, খরচও তেমন পড়ত অনেক। অথচ কলকাতার কাছাকাছি, সুন্দরবন অঞ্চলের টুকরো টুকরো দ্বীপের জঙ্গল পরিষ্কার করে, যদি জমি বাড়ানো যায়, এবং সে জমি নদীর নোনাজলের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য, নদী-বাঁধ দিয়ে চাষ দিলে একদিকে ওই সব দ্বীপে লোকজন যেমন বাড়বে তেমনই ধান উৎপাদন বেড়ে কলকাতার বাড়তি চালের চাহিদাও মেটাবে; কোম্পানির রাজস্বও তাতে বাড়বে। কিন্তু টিলম্যান হেনককেলের এই সদিচ্ছাকে তাঁর প্রতিবেশী জমিদাররা ভাল চোখে নেয়নি।

যাই হোক ১৭৮৬ সালের মধ্যে বাঁশ দিয়ে জঙ্গলের উত্তরভাগের সীমানা ঠিক করেন হেনককেল সাহেব। সে সময় চেন বা ফিতে দিয়ে মাফজোখ করার উপায় ছিল না; একে জঙ্গল, তার ওপর প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বাঘ, কুমির, বন্য বরা, সাপ ও বিষাক্ত পোকামাকড়ের উপদ্রব তো ছিলই। সে জন্য ৪ হাতে ১ লাঠি, এই লাঠির মাপেই মাপ রেখে এগিয়ে ছিলেন তিনি। এবং এভাবেই ইজারাদারদের ভিত শক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন হেনককেল; কিন্তু তাঁর এ প্রচেষ্টা সফল হয়নি তেমন। কেননা ১৭৯২ সালে এসে দেখা গেল অত সীমানার মধ্যে মাত্র ১৬টা তখনও পর্যন্ত টিঁকে আছে। বাকি বাঁশ সবই অদৃশ্য। পরবর্তীকালে অবশ্য অবশিষ্ট ওই ১৬টিকে তালুকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর ইজারাদারদের নাম বদলে বলা হয় তালুকদার এবং তাদের জমিগুলোকে নাম দেওয়া হয় 'হেনককেলের তালুক' নামে।

১৮১০ সালে কলকাতা বন্দরের উন্নতিকল্পে কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তার মধ্যে একটি হল সাগরদ্বীপের কৃষিজমি হাসিল করা ও অন্যটি ডায়মণ্ডহারবারের একটি সজল বন্দর(wet docks)নির্মাণ। এই দুটি পরিকল্পনাই সুন্দরবনের দিকে মানুষের নজর টানে।

১৮১১ থেকে ১৮১৪ সালের মধ্যে সুন্দরবনের জরিপ শুরু হয়। হুগলির পাশুর নদী থেকে জরিপ শুরু করেন প্রথম ডবলু ই মরিসন। পরে এই জরিপ কতটা ঠিক হল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করেন তাঁব ভাই ক্যাপ্টেন হজ মরিসন। সেটা ১৮১৮ সাল এবং এই জরিপ যে সুন্দরবনের উন্নয়নে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে ১৮১০ সালে ক্যাপ্টেন রবার্টসন হুগলি থেকে অবিভক্ত বাংলার নোয়াখালি জেলা পর্যন্ত জলপথের এক জরিপ শুরু করেন। ১৮১৩ থেকে ১৮১৪-এর মধ্যে আবার লেফটেন্যান্ট ব্লেন (Blane) হুগলির পূর্বদিকে সমুদ্রোকূলবর্তী স্থানের জরিপের কাজে মন দেন।

লেফটেন্যান্ট মরিসন তাঁর জরিপের সময় একটা ব্যাপাব লক্ষ করেছিলেন। তিনি জরিপ করতে করতে দেখেছিলেন রায়মঙ্গল নদীর মোহনা থেকে উত্তর-পূর্ব একটা শাখা কালিন্দী নদীর কাছাকাছি এসে পড়েছে। তিনি দুটো নদীর মধ্যবর্তী স্থানটি কেটে কালিন্দীকে রায়মঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। এর ফলে বিপুল পরিমাণ এক মুক্ত জলস্রোত তার গতিপথ বদলে রায়মঙ্গলের ওপর দিয়ে বয়ে চলল। সেই সময় কালিন্দী নদীর পশ্চিমপাড়ের তুলনায় পূর্বপাড়ে অতি দক্ষিণ পর্যন্ত কৃষিকার্য ব্যাপ্ত ছিল। কালিন্দীর গতি পরিবর্তনে এই ব্যাপ্তি কিছুটা মার খেল। তবে পরিবর্তে একটা নতুন জলপথ পাওয়া গেল। নতুন এই জলপথকেই **'মরিসনের কাট'** নামে পরিচিতি দেওয়া হয়।

১৮১৬ সালে সুন্দরবন উন্নয়নের জন্য একটি আইন পাশ করানো হয়। এই আইন মোতাবেকে একজন আধিকারিক নিযুক্ত করা হয়। কোম্পানি 'সুন্দরবনের কমিশনার' নাম দিয়ে এই কমিশনারের হাতে এককভাবে সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করেন। পাশাপাশি তিনি কালেক্টরের কাজও করবেন বলে ঘোষণা করা হয়। তবে সেই সময়, এত সবের মাঝখানেও সুন্দরবনের জঙ্গল হাসিলের কাজ কিন্তু থেমে থাকেনি। জঙ্গল হাসিল করে জমি ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছিল; আর এই হাসিলের কাজে একদিকে যেমন এগিয়ে এসেছিলেন ইজারাদাররা, তেমনই জমিদার শ্রেণী ও অ-নথিভুক্ত ব্যক্তিরাও এর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল।

এ সময়ে মিঃ স্কটের নেতৃত্বে সুন্দরবন অঞ্চলের অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের কাজ চলছিল। তিনি দেখলেন, এই জমি উদ্ধারের কাজ এত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে এবং যেভাবে কৃষিযোগ্য ভূমি বাড়ছে, সে তুলনায় কোম্পানি কোনও রাজস্বই পাচ্ছে না এদের হাত থেকে। উলটে রাজস্বের কথা তুললে ওই সমস্ত জমিদার শ্রেণী এবং ইজারাদাররা বেঁকে বসছে। অথচ জঙ্গল হাসিল করে উদ্ধার করা জমিতে চাষবাস করার অনেক অসুবিধে জেনে, প্রথম থেকে কোম্পানিই এ সমস্ত জমিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বাইরে রাখেন। অবস্থা বিবেচনা করে, ১৮১৭ সালে নতুন এক আইনের বলে কোম্পানির সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চলকে তাদের সম্পত্তি বলে ঘোষণা করেন। অর্থাৎ সুন্দরবনের জমিজমা সমস্ত হবে স্টেটের। স্টেট শুধুমাত্র লীজ দিয়ে যাবে। কিন্তু জমিদার ও ইজারাদাররা এ

সব মানতে চাইল না। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কোম্পানির দিকের উন্নয়নের কাজ এই সময়ে প্রায় বছর চারেকের জন্য থমকে থাকে।

১৮২১ সালে মিঃ ডাল- এর নেতৃত্বে আবার সুন্দরবন অফিসের কাজ চালু করা হয়। এবং এনসাইন প্রিন্সেপ নামে আর এক সাহেবকে পুনর্জরিপের জন্য নিয়োগ করা হয়। তাঁর উদ্দেশ্যে ছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে সরকারি সম্পত্তিকে আলাদা করা। কিন্তু জরিপ শুরু হতেই আবার জমিদার শ্রেণীর বাধা আসতে শুরু করে। তারা বলেই দেয়, এবং বিশ্বাসও করে না যে সরকারি সম্পত্তি বলে যা কোম্পানি চিহ্নিত করার চেষ্টা করে আসছে তা সরকারের। ফলে জটিলতা আবারও সৃষ্টি হয়। প্রিন্সেপ গভীর জঙ্গলে ১৮২২ থেকে১৮২৩-এর মধ্যে যমুনা নদী থেকে হুগলি নদী পর্যন্ত মরিসনের ম্যাপের সাহায্যে নতুন এক জরিপ পর্ব সমাধা করেন। ওই নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী অরণ্যভূমিকে তিনি কতগুলি ব্লকে ভাগ করেন এবং সেগুলোর নম্বরও দেন। এভাবেই সুন্দরবনের লটের সৃষ্টি হয়েছে। পরে অবশ্য এই 'লট' শব্দের অপভ্রংশ রূপ 'লাট' শব্দের প্রচলন পাওয়া যায়। ইংরেজী লট শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট অংশ বা ভাগ। এই লটগুলিকে আবার কিছু প্লটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন 'এ' প্লট, 'বি' প্লট ইত্যাদি। এভাবে সুন্দরবন অঞ্চলে 'এ' থেকে 'এল' পর্যন্ত ১২টা প্লটের পরিচয় পাওয়া যায়। এক একটি লট বা লাট যেসব ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইজারা গ্রহণ করত তাদের বলা হত **লটদার বা 'লাটদার'**। আর যারা ছোট ছোট প্লট বা চক ইজারা নিত তাদের বলা হত **'চকদার'**। সুন্দরবনের বর্তমান গ্রামগুলো এ ভাবেই বিভিন্ন লটদার বা চকদারের নামানুসারে হয়েছে। এ সমস্ত লটদার বা চকদারের মধ্যে যেমন এ দেশীয় ভূ-স্বামীরা ছিলেন তেমনই ছিলেন ইংরেজ ইজারাদাররা। যেমন হেনককেল, ফ্রেজার, ট্রাউয়ার, বেডফোর্ড, ক্যানিং, হ্যারি, হ্যামিলটন, ডালহৌসী, হ্যালিডে, মেকলেন বার্গ, লোথিয়ান, জেমসন, হেনরি, ফ্রেডরিক প্রমুখ ব্যক্তিরা। এগুলি আজও সুন্দরবনের পরিচয়ের সঙ্গে সগর্বে মাথা তুলে আছে।

৩

সুন্দরবনের জমি বন্দোবস্ত, কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকার সুন্দরবনের জমির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য ১৮৫৩ সালে তার শাসনবিধি দ্বারা বৈধ পাট্টা বিলিবন্দোবস্ত করে। ঠিক হয় এই বিলি ব্যবসস্থা নিলামের মাধ্যমে হবে এবং নিলামে যে বেশি টাকা ঘোষণা করবে তাকেই পাট্টা বা লিজ বিক্রি করা হবে। এও ঠিক হয়, এই ইজারা বিক্রি করা জমির ১/৪ অংশের উপর সরকার স্থায়ী কোনও খাজনা ধার্য করবে না। কেননা এই ১/৪ অংশ জমির উপর থাকবে ইজারাদারদের বসত বাড়ি, বাঁধ ও জলস্রোত। এই জায়গাটুকু মুক্ত রাখার নিয়ম রইল প্রত্যেক ইজারাদারদের ক্ষেত্রে। বাকি ৩/৪ অংশ প্রথম ২০ বছরের জন্য খাজনামুক্ত করা হল। কিন্তু ২০ বছর পর থেকে এই খাজনা প্রথমে বিঘা প্রতি ২ পয়সা করে এবং ৯৯ বছরের লিজ বিলির ৫১তম বছরের থেকে প্রতি বছরে সর্বোচ্চ মাত্র ২ আনা করে ধার্য করা হল।

১৮৫৩ সালের শাসনবিধিতে আরও বলা হল, এই বিলি করা, জমির ১/৮ অংশ পরিমাণ জঙ্গল অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে। আর বছর পাঁচেকের মধ্যেই তাকে চাষের উপযুক্ত করে তুলতে হবে। ১/৪ অংশ জমি চাষযোগ্য করে তুলতে হবে ১০ বছরের মধ্যে এবং বাকি ১/২ অংশ জমি ২০ বছরের মধ্যেই চাষযোগ্যের আওতায় আনতে হবে। আর সব মিলিয়ে ৩/৪ অংশ পরিমাণ জমির জঙ্গল সাফ ও জমিকে চাষের জন্য তৈরির কাজ ৩০ বছরের মধ্যেই শেষ করা দরকার। অন্যথায় এই শাসনবিধি অনুযায়ী ইজারাদারদের উত্তরাধিকারী ওই জমি বিক্রি করতে পারবে না! এবং একরারনামা ভঙ্গ করার দায়ে শাস্তি পাবে। এই আইন অনুযায়ী ওই সময়ে লিজ বিলির সংখ্যা ছিল ১৩১টি।

ফ্রি সিম্পল রুলস

এক কথায় বিনা খাজনায় বিক্রি। ১৮৬১ সালে লর্ড ক্যানিং সুন্দরবনের জন্য নতুন এক শাসনবিধি নিয়ে আসেন। এই বিধিই বিনা খাজনায় বিক্রি বা ফ্রি সিম্পল রুলস। এই নিয়মবিধির দ্বারা প্রায় লোকশূন্য ও অকর্ষিত জমির বিলি বন্দোবস্ত করা হয়। এই বিষয়ে ক্যানিং তিনটি প্রধান সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেগুলি হল: (ক) অকর্ষিত জনশূন্য জমির জন্য আবেদনকারীকে চিরদিনের মতো জমি মঞ্জুর করা হবে, যে জমিতে আবেদনকারীর উত্তরাধিকারীদের স্বত্ব বজায় থাকবে এবং জমির হস্তান্তর চলবে। (খ) মঞ্জুরিপ্রাপ্ত জমি-ভোগীদের ইচ্ছে মতো ভবিষ্যতে যত রকমের ভূমি রাজস্ব মুক্ত করার যোগ্য হবে তখনই, সরকারি জমি-দান মঞ্জুর হওয়ার সময় এককালীন পুরো দাম যখন মিটিয়ে দেবে

নদীয়া
বনগাঁ
গাইঘাটা
হাবড়া
গোবরডাঙা
বারাকপুর
বারাসাত
বাদুড়িয়া
দেগঙ্গা
বসিরহাট
দমদম
কলকাতা
হাড়োয়া
টাকি
বালিগঞ্জ
বেহালা
ভাঙড়
বিষ্ণুপুর
ফলতা
ক্যানিং
মাতলা
বাসন্তী
গোসাবা
জয়নগর
মজিলপুর
মথুরাপুর
মেদিনীপুর
কুলপি
কাকদ্বীপ
নামখানা
সাগর দ্বীপ
গঙ্গাসাগর
ফ্রেজারগঞ্জ
বুলচেরি দ্বীপ
স
ন্দ
র
ব
ন
ব ঙ্গো প সা গ র
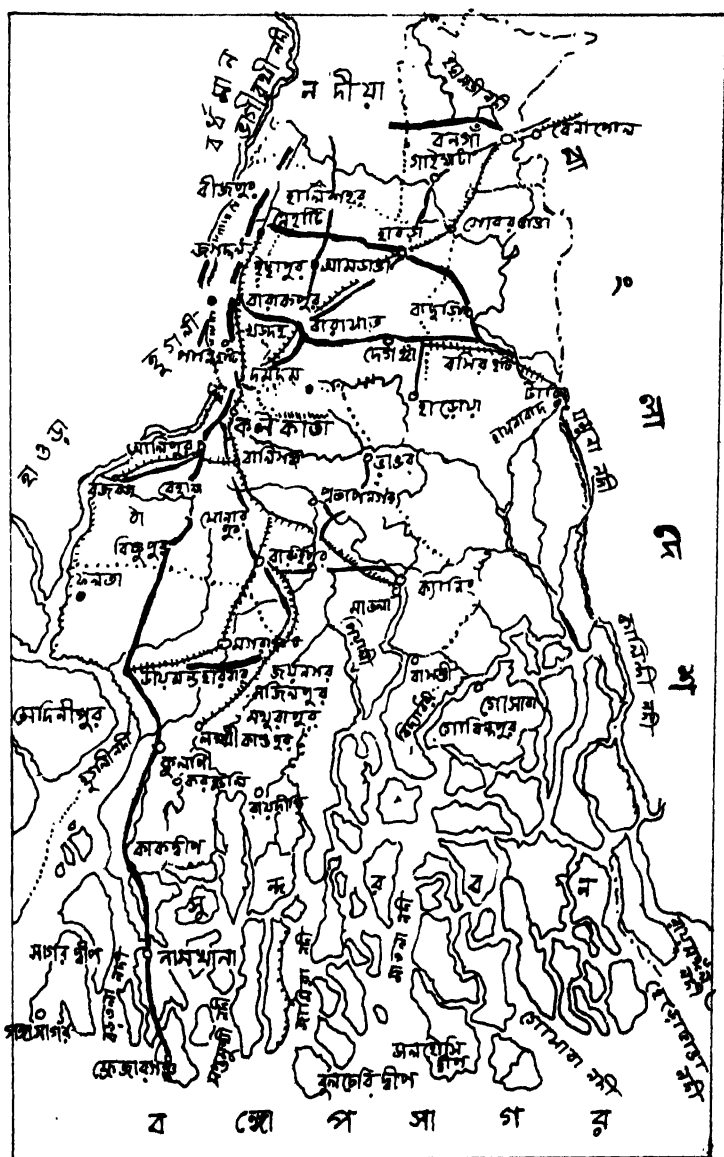
সেই জমি-ভোগী; অথবা জমি-ভোগীরা স্বেচ্ছায় জমির বায়না হিসেবে যখন মোটা টাকার একটা অঙ্ক দিতে পারবে। বাকি টাকার শতকরা ১০ ভাগ হারে দেওয়া হবে এবং যতক্ষণ না সম্পূর্ণ মূল্য মিটিয়ে দিতে পারছে ততক্ষণ সরকারের কাছে জমি বন্ধকের মতো থাকবে, এবং (গ) জমি-ভোগীদের উপর চাষ করা বা জঙ্গল হাসিল করার জন্য বাধ্যতামূলক কোনও শর্ত থাকবে না। অথবা নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির অংশ বিশেষের জন্য কোনও নিদিষ্ট সময়সীমা ঠিক করা হবে না।

ফ্রি সিম্পল রুলস চালু করার কিছুদিন বাদেই খোদ ইংল্যাণ্ড থেকে সরকারি আদেশ এল। এই আদেশে বলা হল, দান মঞ্জুর করার আগে জমি জরিপের প্রয়োজন। আর সমস্ত দান বিক্রির জন্য নিলাম ডেকে সর্বোচ্চ ডাক দানকারীকে দিতে হবে। তবে নিলামের জন্য একটি দর বেঁধে দিতে হবে।

দ্য রুলস অব ১৮৭৯

ফ্রি-সিম্পল রুলস প্রায় ন'বছর কার্যকরী হওয়ার পর বাতিল হল। ১৮৭৯ সালে চালু হল আবার নতুন এক নিয়ম। এই বিধি অনুযায়ী শর্তসহ জমিদান থাকবে দু'রকমের। যেমন (ক) দ্বীপের জঙ্গল-জমি, যা ২০০ একরের বেশি নয় লিজ দেওয়া হবে ছোট ছোট সব বসতকারীদের। (খ) আবার ২০০ একরের বেশি এ ধরনের জঙ্গল-জমি বড় পুঁজির মালিকদের কাছেই শুধুমাত্র ইজারা দেওয়া হবে; কেননা এঁরা ক্ষমতাবান, টাকা এবং সময় খরচ করে এঁরা জঙ্গল-জমিকে চাষযোগ্য করে তুলতে পারবেন। এ রকম জমিগুলিকেই 'লট' বা 'লাট' বলা হয়। আর এগুলির শর্ত সাপেক্ষে যাঁরা মালিক হলেন তাঁরাই হলেন 'লাটদার'।

১৮৭৯ থেকে ১৯০৪-এর মধ্যে যখন এই নিয়মবিধি কার্যকর ছিল, ওই তখনই সুন্দরবনের জঙ্গল-জমির ২,৩০১ বর্গমাইলের মধ্যে ১,২২৩ বর্গমাইল জমি লাটদারদের মধ্যে অনুদান বা লিজ বিলি করেছিল ইংরেজ সরকার।

স্মল ক্যাপিটালিস্ট রুলস

১৮৭৯ সালের নিয়ম অনুযায়ী, ২০০ একরের মধ্যে লিজ দেওয়া ছোট ছোট বসতকারী ইজারাদারদের ক্ষেত্রে বলা হল, তাদের জমি যদি তারা ২ বছরের মধ্যে চাষযোগ্য করে তুলতে পারে তবে ৩০ বছরের জন্য তা ইজারা দেওয়া হবে। এবং প্রথম ওই ২ বছর তারা খাজনা ছাড় পাবে। পরে অবশ্য জমির আয়তন অনুযায়ী ক্রমবর্ধমান খাজনা স্থির হবে। আর ৩০ বছর পরে নবীকরণ হওয়া লিজ জমি আবার ৩০ বছরের জন্য লিজ দেওয়া হবে। খাজনা ধার্যের ব্যাপারেও প্রতিটি নবীকরণের সময়, পার্শ্ববর্তী জমিতে সে সময়ে যে হারে খাজনা ধার্য ছিল, সেই হারেই খাজনা ধার্য করা হবে।

আবার ২০০ একরের বেশি এবং সর্বাধিক ৫,০০০ একর পর্যন্ত জমি ভোগীদের ক্ষেত্রে বলা হল, প্রথমে লিজ-ইজারার মেয়াদ ৪০ বছরের জন্য নির্ধারিত হল এবং ৪০ বছর পরে পুনর্নবীকরণ করা হবে ৩০ বছরের জন্য। 'Under this Rule 1/4th of entire area leased was for ever exempted from assessment, while the remaining of 3/4ths were held free of assessment for ten years.On expiry of the term of the original lease, the land was open to resettlement for a period of 30 years [৩]

বলা হল, ১/৪ অংশের জমিতে রাজস্ব ছাড় দেওয়া হল চিরকালের জন্য এবং বাকি জমির জন্য ১০ বছর কোনও রাজস্ব নির্ধারণ হবে না।

এই আইনে আরও বলা ছিল, কোন জমি কতটা লিজ দেওয়া যেতে পারে তা নির্ধারণ হবে বন বিভাগের সঙ্গে পরামর্শ করে এবং রাস্তার অধিকার ও জলস্রোতগুলিও সংরক্ষিত ছিল। নাব্য জলস্রোতগুলিকে ব্যবহার করার অধিকার, তার উপর দিয়ে নৌকা নিয়ে যাওয়ার অধিকার, প্রতিটি স্রোত-ধারার দুইদিকের ২৫ ফুট চওড়া জমি ব্যবহার করার অধিকারও এই আইনে সংরক্ষিত ছিল, যা কিনা সাধারণ মানুষের অধিকার হিসাবেই স্বীকৃত ছিল।

এ ছাড়া জমি যখন লিজ-বিলি হল তখন জমির উপর গাছপালার জন্য কোনও কর চাপানো হয়নি। বন পোড়ানো, বন কাটা, জঙ্গল পরিষ্কার, প্রজা বসানো, পুকুর খনন প্রভৃতি কাজের জন্য জমির ব্যবহার ইত্যাদিরও উপর কোম্পানি সরকার কোনও কর বসায়নি। কেননা জঙ্গল হাসিল সফলের জন্য এগুলির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কোনও বনজ সম্পদ বাইরে চালান দিলে, তার জন্য শুল্ক বসানোর কথা বলা হয়েছে এ আইনে।

কিন্তু দেখা গেল, বড় রকমের মুনাফা লোটার জন্য জমির দালাল ও ফাটকাবাজরা সামান্য টাকায় জমিগুলিকে লিজ নিয়ে মোটা দামে সেগুলি বিক্রি করে দিয়েছিল। মূল ইজারা দেওয়া দলিলটি ছোট ছোট ইজারা দেওয়া জমিতে ভাগ করে দিয়ে, তার পরিবর্তে নগদ বেশি অর্থ নিয়েছিল ওই সব মুনাফাবাজরা। ফলে ছোট ছোট প্লটের সৃষ্টি হল। এবং দেখা গেল, এই সব ছোট জমির কৃষকরাই জমির জঙ্গল সাফ করে চাষবাস শুরু করেছিল, আবার বর্ধিত হারে তাদেরই খাজনা দিতে হয়েছিল।

শুধু তাই নয়, কোনও বড় লিজ গ্রহীতার অভ্যেস ছিল, প্রলোভন দেখিয়ে প্রজাদের জমি নিতে উৎসাহিত করা, সহজ শর্তে বন হাসিল করা এবং জমিকে

৩. * Imperial Gazetteer for Bengal. 1903-04

চাষযোগ্য করে তোলার জন্য তাদের দেওয়া হয়েছিল নিয়ম বিরুদ্ধ ও আইন-অগ্রাহ্য দলিল। আবার এক কৃষক যখন কোনও জমির জঙ্গল সাফাই করে জমিকে চাষযোগ্য করে তুলত, তখনই সেই কৃষককে উচ্ছেদ করে ওই আইন-অগ্রাহ্য দলিলের মাধ্যমে আবার নতুন এক কৃষককে এনে বসানো হত।

এই শুধু নয়, নদী-নালার দেশ সুন্দরবন। সমুদ্র তাকে ঘিরে রেখেছে। আর অনবরত জোয়ার ভাঁটার দরুন সমুদ্রের সেই তীব্র নোনা জল নদী ও খাড়ি পথে ঢুকছে একেবারে এ সমস্ত জমির চারপাশে। জমিগুলোকে রক্ষা করার জন্য তাই প্রয়োজন হয়েছিল বাঁধের। যাতে নদী উপচে জোয়ারের নোনা জল আবাদে না ঢোকে বা ঝড়-ঝঞ্ঝায় যাতে উন্মত্ত নোনা জলরাশি অক্লেশে ঢুকতে না পারে জমিতে। তাই বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু লাটদার, জমিদার ও ইজারাদাররা এ সমস্ত বাঁধ সারাতে অবহেলা দেখিয়েছে। অথচ লিজ দলিলে বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ অপরিহার্য বলে ধরা হয়েছিল এবং তা বাধ্যতামূলকও করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা তা মানছিল না। এ অবস্থায় বেশ কয়েক বছর যাবার পর, ইংরেজ সরকার বড় পুঁজিপতিদের 'লার্জ ক্যাপিট্যালিস্ট রুলস' অনুযায়ী জঙ্গল-জমি দেবার শাসনবিধি নাকচ করেছিল [It was accordingly decided in 1904 to abandon this system & to introduce a system of Raiyatwani Settlement as an experimental measure in the 24-paraganas Sunderban. Under this system small ares would be let out to actual cultivators assistance being given them by Govt. in the form of Advances, as well as by constructing tanks & embankments, & clearing the jungle for them.][৪] কিন্তু হলে কী হবে, ততদিনে বহু চাষী — যারা শ্বাপদ সংকুল অরণ্যে বাঘ-কুমির, সাপ ও ঝড়-ঝঞ্ঝার বিরুদ্ধে লড়াই করে জমিকে চাষের উপযুক্ত করেছিল। তারা সবাই জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেছে।

১৯০৪ সালে পরীক্ষামূলকভাবে ইংরেজ সরকার রায়তওয়ারি জমির বিলি ব্যবস্থা করেছিল। এই জমি সর্বোচ্চ ৭৫ বিঘা ও সর্বনিম্ন ১০ বিঘার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্রকৃত চাষীকে বিলি করা হয়েছিল। যাদের, সরকার অগ্রিম অর্থ দ্বারা, বাঁধ, পুকুর নির্মাণ ও জঙ্গল সাফাই দ্বারা সাহায্য করেছিল। কিন্তু এ ব্যবস্থা ঠিক কার্যকর হয়নি। ফলে পূর্বতন ব্যবস্থাই আবার ফিরে এসেছিল কিছুকাল পরে। ফলে ভূমির অধিকার পাওয়ার নিয়ম বা পাট্টা বিলি দ্বারা ভূ-সম্পত্তির অধিকার হস্তান্তরের জন্য তৈরি হল এক বিশাল সংখ্যক ভূ-স্বামীর দল।

এই বিশাল ভূ-স্বামী গোষ্ঠীর জন্মের ফলে বছর মেয়াদের লিজ বিলির পাট্টা

৪. Imperiall Gazetteer for Bengal. 1903-04

দিলেও এই ভূ-স্বামীর দল বদলালো না। বরং জমিকে আরও টুকরো টুকরো করে এই সব লাটদার, জমিদারগণ নিচের দিকে লিজের সংখ্যা বাড়িয়ে চলল। যাদের বলা হত —(ক) দর পত্তনীদার, (খ) দর ইজারাদার, (গ) দরগ্রন্থী ও আরও অধস্তন পর্যায়ের জমির লিজ নেওয়া মালিক— **'পাটনী'**।

এভাবে লিজ টুকরো টুকরো হয়ে হস্তান্তরিত হওয়ার ফলে খাজনার হারও ক্রমান্বয়ে বাড়ল। বাড়ল বংশ পরম্পরা মামলা-মকর্দ্দমা। যার প্রতিক্রিয়ায় কৃষকেরা হল সর্বস্বান্ত। নদী ও সমুদ্র পাড়ের বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামতি কিছুই হল না। বন্যা প্রতিরোধ করার কোনও ব্যবস্থার দিকেও কেউ উৎসাহিত হল না। শুধু খাজনা দিতে না পারলে জমি হারাতে হত এবং অন্য কারুর কাছে বেশি খাজনা ও বেশি দামে মূল কৃষকদের জমি হস্তান্তর হয়ে চলল। আর এ অনাচার চলল ভারত স্বাধীন হওয়ার সময় পর্যন্ত। তারপরেও অবশ্য ছিল না যে তা নয়। কিন্তু তা ছিল অন্যভাবে। এবং সে আলোচনা আমরা অন্যত্র করব। তার আগে আমাদের আলোচ্য বিষয় বিশাল এই অঞ্চলের কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা।

কৃষি ও সেচ-ব্যবস্থা

ভূমির প্রকৃতি অনুসারে সুন্দরবন অঞ্চলকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। (১) **উত্তরাঞ্চলের উচ্চভূমি**, (২) **বঙ্গোপসাগরের সন্নিহিত বনভূমি**। আবার আবাদি ও অনাবাদি হিসাবে একে চার ভাগে ভাগ করা যায়। (১) **আবাদ অঞ্চল** (২) **লাট অঞ্চল** (৩) **অসংরক্ষিত চর বা বনভূমি** এবং (৪) **সংরক্ষিত বনভূমি বা অভয়ারণ্য**।

আবাদ অঞ্চল হল পুরনো আবাদি অঞ্চল আর লাট অঞ্চল হল নতুন তৈরি হওয়া আবাদি অঞ্চল। অসংরক্ষিত চর হল অনাবাদি চর বা বনভূমি। এগুলি নতুন দ্বীপ, যেখানে জনবসতি গড়ে ওঠেনি। সবে মাত্র চর সৃষ্টি হয়ে বনভূমি গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ও বাঘ, হরিণ, বরা, বাঁদর, সাপ, কুমির ইত্যাদি বন্যপ্রাণীর বাসস্থান— সেগুলিই সরকারি নিয়ন্ত্রিত সংরক্ষিত বনভূমি বা অভয়ারণ্য।

(১) উত্তরাঞ্চলের উচ্চভূমি

উত্তরাঞ্চলের উচ্চভূমির মাটির প্রকৃতি দোঁয়াশ জাতীয় ও দক্ষিণের তুলনায় অপেক্ষাকৃত উর্বর। এখানকার জলও মিষ্টি। কৃষিকার্যের পক্ষে উপযুক্ত। জয়নগর, বারুইপুর, আমতলা প্রভৃতি এ অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। তবে এ অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। তবে এ অঞ্চলের প্রধান সমস্যা অতি বৃষ্টিতে সঞ্চিত জলের বন্যায় প্লাবন ও জল নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা।

(২) দক্ষিণাঞ্চলের বঙ্গোপসাগরের সন্নিহিত অঞ্চল

সুন্দর বনের দক্ষিনাংশের জমি সাধারণত নিম্ন ও সমুদ্রের নিকটবর্তী হওয়ায় জোয়ারের প্রকোপ এখানে বেশি। মাটি ও জল লবণাক্ত। ৮০০ থেকে ৯০০ এবং কোনও কোনও জায়গায় ১০০০ থেকে ১২০০ ফুট নিচে মিষ্টি জলের

সন্ধান পাওয়া যায়। নলকূপের সাহায্যে এ সমস্ত অঞ্চলে ওই মিষ্টি জল তুলে ব্যবহার করা হয়। আগে লাটদাররা কিছু কিছু জায়গায় মিষ্টি জল পাওয়ার জন্য পুকুর কাটাত। সেই সব পুকুর থেকে তিন চার মাইল দূরের মানুষ এসে জল নিয়ে যেত। তারও আগে এ সব অঞ্চলের অধিবাসীরা নোনা জলের সঙ্গে তেঁতুল মিশিয়ে কোনও রকমে তৃষ্ণা নিবারণ করত।

এ সব অঞ্চলের মাটি লবণাক্ত পলিময় হওয়ায় এখানে প্রথমদিকে ধান চাষ করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া মাটিও এঁটেল কাদা জাতীয়। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনেই জমিগুলিকে কৃষিযোগ্য করে তোলার জন্য একদিন দেওয়া হল তার চারপাশে বাঁধ। যাতে জোয়ারের নোনা জল এসে ঢুকতে না পারে জমিতে। এভাবে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর মানুষের অক্লান্ত চেষ্টায় এসব জমিকেও শেষ পর্যন্ত কৃষিযোগ্য করে তোলা হল। ধান চাষও হতে লাগল। কিন্তু এ কৃষিকাজে সমস্যাও এল বিস্তর। সেই সঙ্গে প্রয়োজন হয়ে পড়ল উন্নত সেচ ব্যবস্থার। উন্নত সেচ ব্যবস্থা বলতে (১) **কৃষিকার্যে সময় মতো জল সরবরাহ** ও (২) **অতি বৃষ্টিজনিত জমা জলকে দ্রুত নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ**— এই দু'রকম সেচ ব্যবস্থাকেই বোঝানো হয়। এর পাশাপাশি আবার আর একটি বিষয়ও এর সঙ্গে সংম্পৃক্ত হয়ে পড়ল। তা হল নদী বা সমুদ্রের সন্নিহিত জমিগুলো থাকায় নোনা জলের হাত থেকে জমিগুলি রক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। প্রয়োজন হয়ে পড়ল সমুদ্র বা নদীর জলোচ্ছ্বাস রোধ। দেখা গেল এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে না তুললে দক্ষিণাংশের সমগ্র জমিই প্রায়শই নোনা জলে ডুবে যাবে। ফলে কৃষিকার্যও অচল হয়ে পড়বে। কাজেই প্রয়োজন হয়ে পড়ল উন্নতমানের ও আধুনিক বাঁধ ব্যবস্থার। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে লাটদার, চকদার, জমিদাররা তাদের নিজের আর্থিক সামর্থ অনুযায়ী, সমুদ্র বা নদীর জলোচ্ছ্বাস রোধ ও জোয়ারের নোনা জলের হাত থেকে জমিকে বাঁচাবার জন্য নদী বা সমুদ্রের ধারে বাঁধ নির্মাণ করেছে। কিন্তু এসব বাঁধ ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্বল। তাছাড়া রক্ষণাবেক্ষণেরও ব্যবস্থা সেভাবে ছিল না। স্বাধীনতার পরে ১৯৫৪ সালে জমিদারি প্রথা বিলোপ পায় এবং সুন্দরবনের মোট ১০২টি দ্বীপের ভেতরে জনবসতি সম্বলিত ৫৪টি দ্বীপমালায় অবস্থিত ৩৫০০ কিলোমিটার নদী বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ১৯৬০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জল বিভাগের ওপর ন্যস্ত হয়। কিন্তু ওই সময় সে বাঁধগুলি উপযুক্ত মানের ছিল না এবং যা ছিল ও যেটুকু ছিল তাও যে ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ হত না তা আগেই বলা হয়েছে। ফলে জলোচ্ছ্বাস ও ঝড়ে ওই সব নদী বাঁধ প্রায়ই ভেঙে যেত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ বিভাগের হাতে ওই সব বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আসায়, সর্বপ্রথম নদীর নোনা জল থেকে দ্বীপের জমি রক্ষার্থে ওই সব বাঁধের সংস্কার শুরু হয়। পরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় আসছি।

৪

নদ-নদী খাঁড়ি ও দ্বীপ

দক্ষিণবঙ্গের নিম্নভূমি বিশাল গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ সুন্দরবনে মানব দেহের শিরা উপশিরার মতো ইতস্তত ছড়িয়ে আছে পরস্পর ছেদি অসংখ্য নদ-নদী, খাঁড়ি ও প্রণালী। ছোট-বড়, চওড়া ও সরু নানা আকারে এরা আরও নিম্নভূমি বঙ্গোপসাগরে ধাবিত হয়ে অসংখ্য দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। এখনও পর্যন্ত পাওয়া হিসেব অনুযায়ী মোট দ্বীপের সংখ্যা ১০২ (তবে সবগুলিতে জনবসতি নেই। মোট ৫৪টি দ্বীপে জনবসতি আছে)। আর নদ-নদীর মধ্যে প্রথমেই যাদের নাম উঠে আসে তাদের মধ্যে **হুগলি, বড়তলা বা মুড়িগঙ্গা, সপ্তমুখী, ঠাকুরাণ, রায়মঙ্গল, ইছামতী, মাতলা, পিয়ালি, বিদ্যা, বিদ্যাধরী, কালিন্দী, কলাগাছিয়া, গোমর, গোসাবা, হেড়োভাঙা, কর্তাল, জামিরা, জগদ্দল** ইত্যাদি নদী উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া আছে আরও অসংখ্য শাখা-নদী, উপনদী, খাল বা প্রণালী।

হুগলি নদী গঙ্গা নদীরই একটি ধারা। আদি গঙ্গা তার গর্ভোত্থিত পলির বাধা পেয়ে, তার মূল স্রোত অপেক্ষাকৃত নিচু জমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পদ্মা নামে পরিচিত এবং একইভাবে তার অন্য একটি ধারা হুগলি নদীরূপে সাগরের দিকে ধাবিত। অর্থাৎ গঙ্গা ধারা উত্তর গাড়োয়ালের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎসারিত হয়ে দেবপ্রয়াগে অলকানন্দার পবিত্র স্রোতধারার সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগে পর্যন্ত এর নাম ভাগীরথী, কিন্তু তারপরেই তার নাম **গঙ্গা**। কিন্তু এই গঙ্গা পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে আবার নাম নিয়েছে **ভাগীরথী**। **গঙ্গা গঙ্গোত্রী** হিমবাহ থেকে ২৫০ কি.মি গিরিপথ বেয়ে সমভূমিতে নেমে এসেছে হৃষীকেশের কাছে। **হৃষীকেশ** থেকে ৩০ কি.মি উত্তরে **হরিদ্বার**। হরিদ্বারের ৭৭০ কি.মি দূরে **প্রয়াগ** ও **প্রয়াগের** ২৪৫ কি.মি নিচে পূণ্যতীর্থ **বারানসী;** তারও পরে ১৪৫ কি.মি পথ অতিক্রম করে গঙ্গার প্রবাহ প্রবেশ করেছে **বিহারে** এবং **রাজমহল** থেকে ১০০ কি.মি নিচে ধুলিয়ানের কাছে **গেরিয়া** গ্রামে গঙ্গার ধারা দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। এর একটি ভাগ যা বাংলাদেশের দিকে ধাবমান, সেটিই হল পদ্মা আর অন্যটি, পশ্চিমবঙ্গের প্রাণপ্রবাহিণী ধারাটিরই **ভাগীরথী**। কিন্তু এই ভাগীরথী আবার কালনার পর থেকে আরও দক্ষিণাংশের দিকে নাম নিয়েছে হুগলি রূপে। অর্থাৎ ভাগীরথীর যে অংশ পর্যন্ত জোয়ার-ভাটা খেলে, তারই নাম **হুগলি**।

'হুগলি' শব্দটি এসেছে পর্তুগীজদের কাছ থেকে। প্রাচীন সপ্তগ্রাম বন্দর

হুগলি পয়েন্ট
ডায়মণ্ড হারবার
রূপনারায়ণ নদী
গেঁওখালি
কুলপি
হলদিয়া নদী
হলদিয়া ডক
হারউড পয়েন্ট
কাকদ্বীপ
রসুলপুর নদী
সাগর দ্বীপ
সাগর
সুন্দরবন
বঙ্গোপসাগর
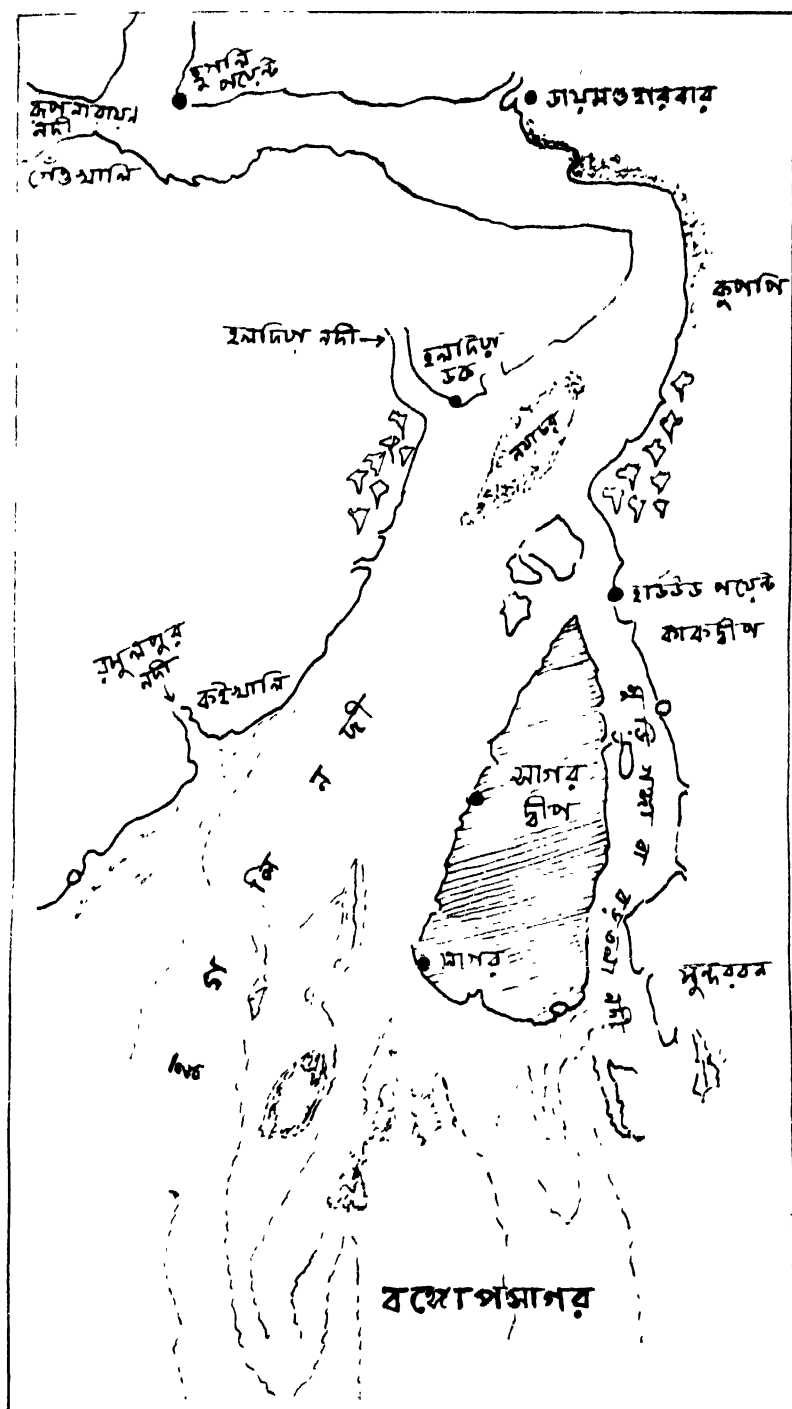
হুগলি নদীতীর সংলগ্ন অঞ্চলে মজে যাওয়ায় সপ্তগ্রাম ছেড়ে হুগলি নদী তীরের উঁচুবাঁধের উপর পর্তুগীজরা হাট বসিয়েছিল। নদী-বাঁধের পশ্চিমে ছিল বড় বড় জলা। গ্রামের মানুষ সে জলায় নেমে সেখান থেকে রোজ গেঁড়ি-গুগলি সংগ্রহ করত। পর্তুগীজরা এই গুগলিকে বলত 'ওগলি'। কেননা পর্তুগীজ ভাষায় 'ওগলি' কথার অর্থ হল গুদাম ঘর। এই 'ওগলি' থেকেই কালক্রমে 'হুগলি'-র জন্ম। আবার অন্য একটি মতও পাওয়া যায়। নদী পাড় সংলগ্ন ওই জলার কাদা অঞ্চলে নাকি প্রচুর হোগলা হত। ওই হোগলা থেকেই পতুর্গীজ উচ্চারণে অবশেষে হুগলি।

হুগলি জোয়ার জলের নদী। এই নদী গঙ্গার জল নিয়ে যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে, তেমনই আবার সমুদ্র-জোয়ারের জল নিয়ে উপরে উঠে আসে। সাগরের সংযোগস্থলে হুগলি নদীর নদীমুখ প্রায় ১৬ মাইল চওড়া। নদী মোহনা থেকে প্রায় মাইল চল্লিশ উপরের দিকে হুগলি নদী আবার দুটি ধারায় বিভক্ত হয়েছে। এই দুই ধারার অন্তবর্তী স্থানের কয়েকটি জায়গায় বিশাল চর ও দ্বীপের চিহ্ন দেখা যায়। দক্ষিণে যেমন **নয়াচর, খাসিমারা, ঘোড়ামারা, লোহাচরা, বেড-ফোর্ড ও সাগরদ্বীপ,** খানিকটা উত্তরে তেমনই নিম্ন-বালারি ও উপর-বালারি এবং আরও খানিকটা উত্তরে ডায়মণ্ডহারবারের কাছাকাছি নদীগর্ভের উপর বিশাল চর।

হুগলি নদীর দুটি ধারার মূল ধারাটি **ঘোড়ামারা দ্বীপ** ও **সাগরদ্বীপের** পশ্চিম পাশ দিয়ে সাগরে মিলেছে। অন্যধারাটির পূর্বতীরে ক্রমশ দক্ষিণের দিকে **কাকদ্বীপ, নামখানা, মৌসুনি, বকখালি** ইত্যাদি দ্বীপমালায় সমৃদ্ধ। এই ধারাই হল মুড়িগঙ্গা বা মড়াগঙ্গা। এই ধারাটি আদি ভাগীরথীর গঙ্গার সর্ব দক্ষিণের রিভার চ্যানেল। ইংরেজরা এসে এর নাম দিয়েছেন 'রোগস্ রিভার' 'গ্যাঙ মানস্ ক্রীক'। কেননা মগ ও পর্তুগীজ দস্যুজাহাজের ঘাঁটি ছিল সেসময়ে এই চ্যানেল বা প্রণালীতেই। এই প্রণালীকেই ইংরেজরা পরে নাম দিয়েছেন 'ক্রীক-চ্যানেল'। এই চ্যানেল ধরেই পূর্ব ও উত্তরের যে সমস্ত পরগনা ছিল সে সমস্ত পরগনা এবং **খুলনা, যশোর, বরিশাল, আসাম ও চট্টগ্রাম পর্যন্ত** নৌ-যান চলাচল করত। জানা যায়, চৈতন্যদেব এই প্রণালী দিয়েই নৌকাযোগে পুরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন।

মুড়িগঙ্গা বা মৃতগঙ্গাই হল আদি ভাগীরথী। এর আর এক নাম **বড়তলা**। ইংরেজ আমলে এর নাম ছিল **'ক্রীক চ্যানেল'**। সেকথা আগেই বলা হয়েছে। পুরাণে বর্ণিত ভগীরথের নিয়ে আসা গঙ্গাই আসলে এই **মুড়িগঙ্গা** বা **বড়তলা নদী**। পূর্ব বর্ণিত সাগর পরগনা ভেদ করে এই নদী একদা সাগর সঙ্গমে মিলিত হত। এই মিলনস্থলের পাশেই কপিল মুনির আশ্রম। এবং ভারতবর্ষের বিখ্যাত সেই গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গন। বর্তমানে সাগর দ্বীপের ভেতরে যে আদিগঙ্গার একটি অংশের ক্ষীণকায়া প্রবাহ দেখা যায় এটিই হল গঙ্গাসাগর খাল। যাই হোক, মুড়ি গঙ্গা বা বড়তলার এই প্রণালীতেই পর্তুগীজ জলদস্যুদের অস্ত্র সজ্জিত

জাহাজের ঘাঁটি ছিল একসময়। তারও আগে ছিল আরাকানের মগ জাতীয় জলদস্যুদের ঘাঁটি। পর্তুগীজ হার্মাদরা মগদের তাড়ায়। আবার ইংরেজরা তাড়ায় হার্মাদদের।

সপ্তমুখী নদীর অবস্থান মুড়ি গঙ্গার পূর্বদিকে। এই দুই নদী মুখের মাঝখানে আছে **নামখানা, বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জ, ফ্রেডরিক, হেনরী ও লোথিয়ান দ্বীপ।** এসব দ্বীপের মধ্যে নামখানায় এখন লোকবসতি অনেক বেশি। আগের তুলনায় জঙ্গলও অনেক কম। জঙ্গল অনেক কম হলেও বকখালি কিংবা ফ্রেজারগঞ্জ নামখানার মতো জন বসতিপূর্ণ নয়। তবে শ্বাপদ সঙ্কুল না হলেও জঙ্গল আছে। আর ফ্রেডরিক, হেনরি ও লোথিয়ান দ্বীপ তো এখনও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। তবে বাঘ নেই এসব জঙ্গলে। আছে সাপ, হরিণ, কুমির, বরা (বুনো শূকর) ও বাঁদর। মুড়ি গঙ্গার প্রণালী থেকে পূর্বদিকে সপ্তমুখী নদী একটি যোগাযোগকারী নদী দ্বারা সংযুক্ত। এই নদীর নাম **দোয়ানিয়া**। স্থানীয় ভাষায় **হাতানিয়া-দোয়ানিয়া।** সরু এই নদীর দুই প্রান্তেই সরকারি বাঁধানো সড়ক। একটি কলকাতা থেকে ডায়মণ্ডহারবার হয়ে কাকদ্বীপ ছুঁয়ে সোজা এসে নামখানায় এই নদীর প্রান্তে শেষ হয়েছে। অন্যটি অন্যপ্রান্তে নদীর পাড় থেকে সোজা চলে গেছে বকখালি।

মুড়িগঙ্গা এবং সপ্তমুখীর জোয়ারের জল একই সঙ্গে হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদীতে প্রবেশ করে পরস্পর ধাক্কা খেয়ে উঁচু হয়ে দু'পাশের দ্বীপগুলিতে বাঁধ ভেঙে অনেক সময়ই ঢুকে পড়ে।

সপ্তমুখী নদী লোথিয়ান দ্বীপকে মাঝখানে রেখে ডানদিকে উত্তর ও দক্ষিণ **চন্দনপিঁড়ি, হরিপুর, মহারাজগঞ্জ, দেবনিবাস** এবং বাঁদিকে **ব্রজবল্লভপুর** ও **গোবিন্দপুর** আবাদকে ফেলে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে।

ঠাকুরাণ নদী জয়নগর ও মথুরাপুর থানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত এবং নিম্নভূমিতে **জামিরা** নাম নিয়ে সমুদ্রে মিশেছে। জামিরা যেখানে নাম নিয়েছে তার একদিকে সংরক্ষিত বন অপরদিকে পাথরপ্রতিমা থানার ১৩টি দ্বীপের সমন্বয়।

বিশাল শাখা প্রশাখা যুক্ত **মাতলার** নদী মুখ আলিপুর ও বসিরহাট মহকুমার মধ্যে অবস্থিত। এই নদী কখনও সরু, কখনও প্রশস্ত আবার কখনও বা বিশাল আকারে এপার ওপার হারিয়ে যেন সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। করতোয়া, আঠারবাঁকি এবং বিদ্যাধরী নদীর মিলিত ধারায় **মাতলা নদীর** উৎপত্তি। 'মাতলা' নামটি এসেছে মত্ততা থেকে। অর্থাৎ করতোয়া, আঠারবাঁকি ও বিদ্যাধরী নদীর মিলিত জলস্রোতের ভয়ংকর রূপ এবং গতিবেগের মত্ততা থেকেই **'মাতলা'** নামের জন্ম। তা নামের সঙ্গে সত্যিই এই নদীর অপূর্ব সামঞ্জস্য। ইংরেজ কোম্পানির আমলে মাতলা ছিল প্রচণ্ড চওড়া। বহু নদীও ছিল এর সঙ্গে যুক্ত। শুধু তাই নয় কলকাতার সঙ্গে পূর্বের জেলাগুলিকেও জলপথে যুক্ত রেখেছিল এই নদী।

বর্তমানে এই নদী জোয়ারের জলের নদী। এ ছাড়া ঝড়-ঝঞ্ঝা আর জলোচ্ছ্বাসে বাঁধ ভাঙে, গ্রাম ভাসায়।

রায়মঙ্গল নদী এসেছে লট নং ১০৭ ও লট নং ১০৮ -এর সন্ধিস্থল থেকে **যমুনা নদীরই** একটি শাখা হয়ে। অপর শাখাটি হল **কালিন্দী নদী**। **কালিন্দী** আবার পারগুমটিকে (লট নং ১৬৩) বেড় দিয়ে এসে রায়মঙ্গলেই মিশেছে। তারও আগে এই দুটি নদীর উৎস যে **যমুনা নদী** সেই যমুনার উৎস **ইছামতী নদী**। উক্ত নদী চক্রাকারে নানা জায়গায় কখনও বাদুড়িয়া, বসিরহাট, কখনও টাকি, শ্রীপুর ও দেবহাট্টার (খুলনা/বর্তমানে বাংলাদেশ) দিকে ঢুকে গেছে। ঢুকে ওদিক থেকে সুন্দরবনের (বাংলাদেশের সুন্দরবন) ভেতর দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে।

বসিরহাট মহকুমার নিচের দিকে সুন্দরবনের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পাশ দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে **হেড়োভাঙা নদী**। হাসানাবাদ থানার অধীনে কতগুলি জোয়ারের জলস্রোত মিলিত হয়েই **কলাগাছিয়া নদীর** উৎপত্তি। এই নদী সন্দেশখালির নিচে **ঘটিহারা নদীর** একটি মুখ নিয়ে **বড়কলাগাছিয়া** নদী নামে রায়মঙ্গলে পড়েছে। আর অন্যদিকে মঠবাড়ি আবাদের পাশ দিয়ে বয়ে আসা **বিদ্যা নদীর** শেষ প্রান্তে **ছোটকলাগাছিয়া** নামে পরিচিত হয়ে **বড়কলাগাছিয়ায়** এসে মিশেছে।

বিদ্যাধরী জোয়ার ভাটার নদী। অনবরত সমুদ্রের জল যাতায়াত করে এই নদীতে জোয়ার ভাটার মাধ্যমে। বিদ্যাধরীর উৎসও সুন্দরবন অঞ্চল থেকে। এরপর জিলাপির মতো পাক খেয়ে খেয়ে নিম্নমুখে দক্ষিণ-পূর্বমুখী প্রবাহিত হয়ে ক্যানিং থানার উপর দিয়ে নেমে গিয়ে লট নং ৫০, ৫৬ ও ৫৭ -এর সংযুক্ত অঞ্চলে 'করতোয়া' এবং আঠার বাঁকির নদীমুখে গিয়ে পড়েছে। এই তিন নদীর মিলনস্থল থেকেই আবার শুরু হয়েছে **মাতলা**।

পিয়ালী নদীর উৎপত্তি স্থল বিদ্যাধরী নদীর দক্ষিণ-পূর্ব মুখী প্রবাহ পথের নিচের দিকে। বামন হাটার কাছাকাছি। ভারি সুন্দর নামের এই নদী পিয়ালী ছিল একসময়ে জোয়ার ভাটার নদী ও 'দোয়ানিয়া'। 'দোয়ানিয়া' কথাটির অর্থ যে নদীর দুই মুখ দিয়েই জোয়ার-ভাটা খেলে। অর্থাৎ সমুদ্র থেকে জোয়ারের জল বিপুল বেগে ধেয়ে এসে নদীর দুই মুখ দিয়েই ঢোকে এবং ভাটায় দুই মুখ দিয়েই আবার বেরিয়ে যায়। এই দোয়ানিয়া নদীর একটা সুবিধে এই যে নদীপথ দিয়ে কম সময়ে নৌ-চলাচল করা যায়। তবে দু'দিক দিয়েই জোয়ার-ভাটা খেলায় পলি জমে বেশি। নদীগর্ভ পাশের জমির তুলনায় ক্রমান্বয়ে উঁচু হয়ে ওঠে। ফলে দু'পাশের বাঁধ আরও উঁচু হয় এবং দুধারের জমির জল নিষ্ক্রমণে ক্ষমতা না থাকায় তা একটা বেসিনে পরিণত হয়। পিয়ালীর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

এ তো গেল সুন্দরবনের প্রধান কিছু নদ-নদীর কথা। কিন্তু এসব নদ-নদী

ছাড়াও গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের ওই নিম্ন অঞ্চলে আছে আরও অসংখ্য শাখানদী, উপনদী, খাল বা প্রণালী। এ-ছাড়া আছে অসংখ্য খাঁড়ি ও দ্বীপ।

এমনিতেই মোট ১০২টি দ্বীপমালায় অবস্থিত নদী-নালা, জল-জঙ্গল ও জনবসতিপূর্ণ এক বিশাল গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ এই সুন্দরবন। কিন্তু ১০২টি দ্বীপমালার সবগুলিতে জনবসতি নেই। আছে কিছু বন্যপ্রাণী ও ম্যানগ্রোভের জঙ্গল। নদী, মোহনা বা খাঁড়িগুলি এই সব দ্বীপগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। সব চেয়ে বড় দ্বীপগুলি দেখা যায় পশ্চিম থেকে পূর্বে। হুগলি নদী, মুড়িগঙ্গা ও বঙ্গোপসাগরের মাঝে অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপের সমষ্টি মিলে **সাগরদ্বীপ**। পুরাণখ্যাত কপিল মুনির আশ্রম এখানে। এবং এখানেই গঙ্গাসাগর মেলা বসে। পৌষ মাস অন্তে মকর সংক্রান্তির স্নান করতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী এখানে আসে। সাগর দ্বীপের পাশেই আছে বেড ফোর্ড ক্যানালের পাশে **বেড ফোর্ড মার্ক**। পাশে **লোহাচরা**। তারও পাশে **ঘোড়া মারা**, তারও পাশে **খাসিমারা**। সপ্তমুখী নদীর মোহনায় **ফ্রেজারগঞ্জ**। সপ্তমুখী নদীর মুখে **লোথিয়ান দ্বীপ** । এবং বিশাল এই দ্বীপে এখনও পর্যন্ত কোনও জনবসতি গড়ে ওঠেনি। তবে বাঘ নেই এখানে। বন্য প্রাণীর মধ্যে আছে বন্য শূকর, হরিণ, বাঁদর, গো-সাপ, বেজি, সাপ, পাখি ইত্যাদি। মাতলা ও জামিরা নদীর মাঝখানে রয়েছে **বুলচেরি দ্বীপ**। মাতলা ও গোসাবা নদীর একপাশে রয়েছে **মায়াদ্বীপ** ও **ডালহৌসি** দ্বীপ। মাতলা নদী মোহনার মধ্যে **হ্যালিডে দ্বীপ**। গোসাবা নদীমুখে **বাঙ্গাদুনি** নদীর ধারে **বাঙ্গাদুনি দ্বীপ**। এছাড়া বঙ্গোপসাগরের প্রান্ত ঘেঁষা **কলস দ্বীপ, বিজোয়াড়া দ্বীপ** এবং ওদিকে **মৌসুনি, জম্বু দ্বীপ**।

এ সমস্ত দ্বীপের মধ্যে মৌসুনি, ঘোড়ামারা, সাগর ও জম্বুদ্বীপ ছাড়া অন্যান্য দ্বীপগুলিতে জনবসতি নেই। গভীর জঙ্গল ও হিংস্র বন্যপ্রাণী পরিবৃত। অবশ্য জম্বুদ্বীপের আয়তন অনুযায়ী জনবসতি সেভাবে গড়ে ওঠেনি। ওঠার কথাও নয়। লম্বায়, উত্তর-দক্ষিণে প্রায় পাঁচ-ছ'কিলোমিটার এবং চওড়ায় প্রায় চার কিলোমিটার আয়তনের এই দ্বীপে স্থায়ী বাসিন্দা হাজার খানেকের বেশি নয়। এই আয়তন অবশ্য প্রতিদিনই বাড়ছে কমছে। জেলে, মাঝি-মাল্লা, কিছু স্থানীয় মানুষ, তাঁদের মাছ ধরার জীবিকা ও অসংখ্য পাখি নিয়ে এই জম্বুদ্বীপ কখনও জলের তলায়, কখনও বা জলের উপরে। অবশ্য দ্বীপের সবটাই যে জলমগ্ন হয় তা নয়। কিছু অংশ জেগে থাকে।

অন্যান্য অধিকাংশ দ্বীপের মতো এই দ্বীপে বড় গাছ বা বন্য প্রাণী প্রায় নেই বললেই চলে। আছে গরানের ছোট ছোট জঙ্গল, বড় লম্বা ঘাস আর বিষধর সব নানা সাপ।

বনাঞ্চলের উদ্ভিদ, বন্যপ্রাণী, বনজ সম্পদ ও সামুদ্রিক সম্পদ

আগেই বলা হয়েছে, স্বাধীন ভারতবর্ষের বিভক্ত বাংলার ৩০৮৯ বর্গ মাইল বা ৭৯১০ বর্গ কিলোমিটার এলাকার ভেতরে ১৬২৯ বর্গমাইল অঞ্চল জুড়ে রয়েছে নদী-নালা ও খাঁড়িসহ সংরক্ষিত বনাঞ্চল। এই সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ভেতরেই রয়েছে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ। এগুলি হল **পাইন, কেওড়া, গরান, গর্জন, গেওয়া, খলসি, কাঁকড়া, টোড়া, বকুল, সুন্দরী, পশুর, হেঁতাল, গোলপাতা, ইত্যাদি। এছাড়া আছে নানা জাতের ঝাউ, বাবলা, ইউক্যালিপটাস, আকাশমণি, সবাবুল, বেত, ওড়া, লোহা ও গাব** জাতীয় বৃক্ষ। তবে এদের মধ্যে অনেকগুলি সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পে বাইরে থেকে আনা বৃক্ষ। আর এগুলি বর্তমানে সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায়। কিন্তু প্রথমোক্ত উদ্ভিদকূল 'ম্যানগ্রোভ' পর্যায়ের বৃক্ষ।

কিন্তু 'ম্যানগ্রোভ কোনগুলি! শব্দটি আমরা প্রতিনিয়তই শুনে থাকি। কাজেই এই শব্দের বৃক্ষগুলিকে একটু আলাদা করে চিহ্নিতকরণের প্রয়োজন আছে। প্রকৃতপক্ষে যে সমস্ত বৃক্ষ, ঝোপঝাড় বা গুল্ম সমুদ্র অধ্যুষিত অঞ্চলে জন্মায় সামগ্রিক ভাবে তাদেরই বলা হয় **ম্যানগ্রোভ**। বিশিষ্ট উদ্ভিদবিজ্ঞানী বাকনি, এ-ব্যাপারে আরও একটু বুঝিয়ে বলেছেন। তাঁর লেখা থেকে জানা যায়, যে সব অরণ্যে লবণাম্বুজ উদ্ভিদ জন্মায় সেগুলি **'ম্যানগাল'**। আর সেই সব অরণ্যের এক একটি প্রজাতিই হল **'ম্যানজোভ'**। **'ম্যানজোভ'** শব্দটির অর্থ করলে বলা যায়, সুন্দরবন অঞ্চলের সুন্দরী জাতীয় উদ্ভিদকূলই হল **ম্যানজোভ** বা **ম্যানগ্রোভ**।

পৃথিবীর সমস্ত জায়গায়ই, ক্রান্তীয় অঞ্চলে **ম্যানগ্রোভ** দেখা যায়। তবে বৈচিত্র্যে তারা এক এক দেশে এক এক রকম। যেমন পশ্চিম আফ্রিকা ও আমেরিকা মহাদেশের উপকূল অঞ্চল থেকে ভারতবর্ষ ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ম্যানগ্রোভের বৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি। পশ্চিম আফ্রিকা ও আমেরিকায় এ-পর্যন্ত মোট ছয় থেকে সাতরকম প্রজাতির লবণাম্বুজ উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু ভারতবর্ষ ও প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে পাওয়া গেছে প্রায় ৬০।৬২ রকম লবণাম্বুজ উদ্ভিদ ও গুল্ম। তবে বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতায় ম্যানগ্রোভের মহিমা দেখা যায় বেশি বঙ্গোপসাগরের ব-দ্বীপ অধ্যুষিত অঞ্চল, মালাক্কা প্রণালী, বোর্নিয়, নিউগিনি, থাইল্যান্ড ইত্যাদি দেশের কিছু কিছু অঞ্চলে। এছাড়া অফ্রিকার পূর্বাঞ্চলে জাম্বেসি ও রুফিসি নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে রয়েছে বিশাল এলাকা জুড়ে ম্যানগ্রোভের

সারি। ভারত ও বাংলা দেশের গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপ এলাকায় রয়েছে পৃথিবী অন্যতম বৃহত্তম ম্যানগ্রোভের সারি। এসব ছাড়াও আছে ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলে মহানদী, গোদাবরী এবং কৃষ্ণা নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে ম্যানগ্রোভের বন। আর প্রকৃতির এই বিচিত্র উদ্ভিদ জগৎ জন্ম নিয়েছে বেশির ভাগই উপকূলে আশ্রিত অঞ্চলে। কখনও বড় বড় নদীর মোহানা অঞ্চলে তাদের আবাস গড়ে উঠেছে, আবার কখনও তারা আবাস গড়ে তুলেছে বালিয়াড়ি ঢাকা অগভীর উপহ্রদ অঞ্চলে। এ সব অঞ্চলে সমুদ্রের নোনা জলের অবাধ যাতায়াতের জন্য এরা এসব জায়গায়ই বেশি পছন্দ করে। আর পছন্দ করে অক্সিজেনের তুলনায় হাইড্রোজেন সালফাইড। তাই সমুদ্রের কাছাকাছি বালি মাটিতে এরা জন্মায় বেশি। কেননা এখানকার মাটিতে অক্সিজেনের তুলনায় হাইড্রোজেন সালফাইড-এর পরিমাণ থাকে বেশি। এছাড়া এ ধরনের মাটিতে প্রচুর 'হিউমাস'-ও থাকে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ম্যানগ্রোভ অধ্যুষিত অঞ্চলের পরিমাণ ৬৮৭ হেক্টর [সুন্দরবন জীবমণ্ডল সংরক্ষণের ১৯৮৯-৯০ থেকে ১৯৯৩-৯৪ এর হিসেব অনুযায়ী]।

এখন প্রশ্ন হল, মানুষের কাছে ওই ম্যানগ্রোভের পরিচয় কতদিন থেকে?

মোটামুটি ইতিহাস খুঁজলে পাওয়া যায়, প্রাচীন কাল থেকে মানুষের কাছে গরান, বাইন, সুন্দরী ইত্যাদি ম্যানগ্রোভের পরিচয় ছিল। প্রাচীন কালে আরবদেশের নাবিকরা যে সব জাহাজ ব্যবহার করতেন, সেসব জাহাজের মাস্তুল তৈরি হত সম্পূর্ণ একটি ম্যানগ্রোভের কাণ্ড থেকে। আবার এই ম্যানগ্রোভ কেটে তক্তা বানিয়ে তা থেকে তৈরি হত জাহাজ। মজার কথা, ২০০০ ও ৩০০০ হাজার খৃষ্ট-পূর্বাব্দে বর্তমান বাহরিণ থেকে যে সব জাহাজ ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে বাণিজ্য করতে আসত, সেই সব জাহাজের সামনের ও পেছনের অংশ তৈরি হত গরান, বাইন, প্রভৃতি ম্যানগ্রোভের কাঠের তক্তার দ্বারা। তাছাড়া লবণাম্বুজ কাঠে নোনা ভাব থাকার জন্য উই পোকা ধরে না। আর ধরে না বলেই সিঙ্গাপুর, পূর্ব আফ্রিকা এবং আরবে এখনও পর্যন্ত ওই সমস্ত ম্যানগ্রোভের কাঠ দিয়ে মানুষ ঘরবাড়ি তৈরি করে।

এসব ছাড়াও ম্যানগ্রোভের আরও অনেক ব্যবহার আছে। কোনও কোনও গাছের [ম্যানগ্রোভ জাতীয় বৃক্ষের] ছালের চামড়া ট্যান করার পক্ষে উপাদেয়। আবার পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের দুর্ভিক্ষের সময় এ-সমস্ত ম্যানগ্রোভের ফল খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে দেখা গেছে। তাই বা কেন, এখন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে সুন্দরবনের ব-দ্বীপ অঞ্চলে কেওড়ার [এক ধরনের প্রজাতির ম্যানগ্রোভ] খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে ওই অঞ্চলের দরিদ্র-মানুষেরা।

এ তো গেল ম্যানগ্রোভ সম্পর্কে মানুষের ব্যবহারিক পরিচয়! কিন্তু ম্যানগ্রোভ কি ব্যবহারিক পরিচয় রেখেছে! আসলে ম্যানগ্রোভের পরিচয় মানেই পরিবেশের পরিচয়। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে ম্যানগ্রোভ এক বিরাট ভূমিকা

নিয়েছে। প্রথমত উপকূল অঞ্চলে সমুদ্রের হাত থেকে ভূমি-ক্ষয় এড়াতে ম্যানগ্রোভ যেমন প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে তেমনই আঞ্চলিক জল হাওয়াও নির্ভর করে এই প্রজাতির উদ্ভিদ কূলের উপর। যেমন সুন্দরবনের ভূমিক্ষয় সমস্যার কারণগুলির অন্যতম একটি হল মানুষেরই নির্মম আঘাতে ম্যানগ্রোভ নিশ্চিহ্ন করণ। যে পরিমাণে সমস্ত উদ্ভিদকূলকে কেটে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে তাতে এখনও সচেষ্ট না হলে ভবিষ্যতে যে সুন্দরবনের ভূমিক্ষয় সমস্যা আরও বাড়বে তাতে সন্দেহ নেই।

এই সব বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েই ইউনেস্কো সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভের উপর বিভিন্ন আলোচনা সভার মাধ্যমে কতগুলি বিষয় ঠিক করেছেন: [১] সুন্দরবনের অধিবাসীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ [২] ম্যানগ্রোভকে জাতীয় জীবনের উন্নতিতে কী করে কাজে লাগানো যায়, তার অনুসন্ধান [৩]ম্যানগ্রোভ এলাকার পরিবেশ ও মানুষের উপর তার প্রভাব বিস্তার[৪] ম্যানগ্রোভ এলাকার পরিবেশ ও মানুষকে অবহিত করা এবং [৫] জনশিক্ষা, গবেষণা ও পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান।

এতক্ষণ ম্যানগ্রোভের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটা রূপরেখা দেওয়া গেল এবার ম্যানগ্রোভের বাইরের যে সমস্ত বৃক্ষ সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে দেখা যায় সেগুলি সম্পর্কে একটু আলোচনা করে নেওয়া যেতে পাতে।

ম্যানগ্রোভ ছাড়াও যে সমস্ত বৃক্ষ সুন্দরবন অঞ্চলে দেখা যায় সেগুলি হল **বাবলা, আকাশমণি, সুবাবল, ইউক্যালিপটাস, ঝাউ, দেবদারু, চৌরাসিয়া, কেটকি** ইত্যাদি। এই সমস্ত গাছের অনেকগুলিই যে **সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পে লাগানো** হয়েছে তা আগেই বলা হয়েছে। এগুলি লাগাবার কারণ, স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত ও পরিবেশের ভারাসাম্য বজায় রাখা। সুন্দরবনের চারিদিকে অসংখ্য জোয়ার ভাটার নদনদী, খাঁড়ি ইত্যাদি ছড়িয়ে থাকায় জলও তাই অফুরন্ত। কিন্তু সে জল কৃষিতে ব্যবহার যোগ্য নয়; কেননা সমুদ্রের জল জোয়ারের অনবরত চাপে এ সব নদনদী-খাঁড়িতে ঢুকে পড়ায় উক্ত নদনদী ও খাঁড়ির জল লবণাক্ত। উপরন্তু সাইক্লোন বা ভয়ংকর কোটালে এসব নদ-নদীর বাঁধ অনেক সময় ভেঙে গিয়ে হু হু করে নোনাজল ঢুকে পড়ে আবাদি অঞ্চলে। ফলে চাষের জমি থেকে মিষ্টি জলের পুকুর পর্যন্ত নোনাজলে ডুবে যায়। জল সরে গেলেও পরে জমি হয়ে পড়ে লবণাক্ত। ফলে ফসলও হয় না। বেশ কয়েকবার বৃষ্টিতে ধুয়ে মাটির নোনাভাব কেটে গেলে তবেই আবার আবাদ করা সম্ভব হয়ে ওঠে। তাই দরকার স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত। আরও একটি কারণে বৃষ্টিপাতের দরকার। সুন্দরবন অঞ্চলে ভূ-গর্ভের জল তুলে চাষ প্রায় হয় না বললেই চলে। কেননা এসব অঞ্চলে কোথায়ও ৭০০/৮০০ ফুট ও কোথায়ও কোথায়ও ১২০০/১৫০০ ফুট মাটির নিচে ভূ-গর্ভস্থ ভালো জল পাওয়া যায়। এবং ভূপৃষ্টের জল যেহেতু

লবণাক্ত তাই বৃষ্টিপাতই চাষীদের একমাত্র ভরসা। সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পে, সমস্ত বৃক্ষগুলিতে আরও বেশি বেশি করে লাগানোর কথা বলা হচ্ছে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতে কারণে।

বন্যপ্রাণী

সুন্দরবনের বন্যপ্রাণীর কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই যে প্রাণীর কথা বলা দরকার তা হল এ অঞ্চলের **ব্যাঘ্রকূল**। কেননা পৃথিবীর ব্যাঘ্র মানচিত্রে সুন্দরবন এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এ রকম বৈচিত্র্যপূর্ণ অরণ্য পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল যেখানে প্রকৃতির মাঝখানে বন ও বন্যপ্রাণী এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ। অবশ্য সুন্দরবনের বাঘ পৃথিবীর মানচিত্রে বিশেষ স্থান অধিকার করলেও এই বনাঞ্চলে অন্যান্য অসংখ্য প্রাণীরও সন্ধান মেলে। যেমন বাঘের পরেই আসে **হরিণের** নাম। হরিণ ছাড়াও আছে **বাঁদর, শেয়াল, বন বিড়াল, সজারু, কটাশ, বেজি, কুমির, নানান রঙ বেরঙের দেশি ও বিদেশি পাখি, কচ্ছপ, সাপ, মৌমাছি, বুনো শূকর, কাঁকড়া, কামট, গোসাপ** ও নানা ধরনের অসংখ্য **মাছ** এবং **হাঙর,** ইত্যাদি। জল জঙ্গলের বুকে এ এক অত্যাশ্চর্য সমারোহ।

সুন্দরবনের প্রাণীকূলের প্রজনন কর্ম অনেকাংশেই নির্ভর করে চন্দ্রের অবস্থানের উপর। প্রজনন ছাড়াও সামুদ্রিক প্রাণীদের খাবারের সময়ের হিসেব ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড সামুদ্রিক জোয়ার-ভাঁটার ওঠার উপরই নির্ভর করে। বাঘের প্রজনন ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডও এই প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়ে।

সুন্দরবনের বাঘ অতি ধূর্ত ও চতুর। যেমন ধূর্ত তেমনই এদের আক্রমণের ক্ষিপ্রতা। এরা জঙ্গলের ভেতরে যূথবদ্ধ জীবন পছন্দ করে না। সঙ্গিহীন একা ঘুরে বেড়ায়। নিঃশব্দে, আপন খেয়ালে, শিকারের খোঁজে। সুন্দরবনের একটি পূর্ণ বয়স্ক বাঘ দাঁড়ালে কাঁধ পর্যন্ত ৩৬ ইঞ্চি থেকে ৪০ ইঞ্চি পর্যন্ত উঁচু হয়। এর মাথার পরিধি ২৭ ইঞ্চি। ঘাড় ৩২ ইঞ্চি। এই ৩২ ইঞ্চি গর্দানের জোরে যে কোনও বাঘ অতি সহজেই যে কোনও শিকারকে তার ঘাড়ের উপরে তুলে নিতে পারে। একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ বাঘ লম্বায় প্রায় ১১ ফুটের কাছাকাছি এবং ওজন ৭ থেকে ৭½ মন আর বাঘিনী ৯ ফুট থেকে ৯½ ফুটের বেশি হয় না।

বাঘিনী সাধারণত এক একবারে দুটি বা তিনটি বাচ্চা দেয়। কখনও পাঁচটি বা ছটি বাচ্চারও জন্ম হয়। সব ঋতুতেই এদের গর্ভ সঞ্চার হয়। আর বাঘিনী গর্ভ ধারণ করে ১৪ বা ১৫ মাস। বাচ্চা জন্মায় সাধারণত বর্ষার পরে। নভেম্বর থেকে এপ্রিল বা জুন মাসের ভেতরে। গর্ভ ধারণ করার পরেই বাঘিনী আলাদা জীবন যাপন করে। আর বাচ্চা হলে বাচ্চারা যতদিন পর্যন্ত না, জঙ্গলে একলা চলাফেরা করতে পারে এবং যতদিন পর্যন্ত না শিকার ধরায় সক্ষম হয় ততদিন

পর্যন্ত মা-বাঘিনী সব সময় বাচ্চাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। এই সময় সে যেমন শিশুদের সঙ্গে থাকতে ভালোবাসে তেমনই পুরুষ বাঘকে এড়িয়ে চলে। তবে পরবর্তী ঋতুর সময় এলে, পুরুষ বাঘের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সময়ের মধ্যে বাচ্চারা সক্ষম ও শিকারে পটু হয়ে ওঠে। তখন বাঘিনী আর তাদের সঙ্গ দেবার প্রয়োজন মনে করে না। নতুন করে গর্ভধারণে উৎসাহী হয়ে ওঠে।

বাঘের মাথা বড় ও গোলাকৃতি। চোখ জোড়া বেশ বড় ও অত্যুজ্জ্বল। চাহনি সুতীব্র ও ভয়ংকর। জীবজন্তু শিকারের পর বাঘ প্রথমে শিকারের কাঁধ থেকে রক্ত পান করে। তারপর শিকারের পায়ের দিক থেকে খেতে শুরু করে। সুন্দরবনের বাঘের গায়ের ডোরা কাটা দাগের জন্যই এরা যেমন আকৃতিগত দিক থেকে ভারতবর্ষের অন্যান্য অরণ্যের বাঘের থেকে আলাদা, তেমনই প্রকৃতিগত ভাবে এদের ক্ষিপ্রতা-হিংস্রতা-প্রচণ্ড বুদ্ধি ও নিঃশব্দে চলাফেরার জন্যও এরা আলাদা।

বাঘের বয়স তাদের উঁচু ও গজিয়ে ওঠা হাড়ের চিহ্ন দেখে বোঝা যায়। এই হাড়গুলি মাথার খুলির ওপর দিয়ে চলে গেছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এগুলি স্পষ্ট হতে শুরু করে। বয়স বাড়লে বাঘের দুই চোয়ালের চারটি দাঁত ফাঁপা হয়ে যায়। গোড়া হাঁ হয়ে যায়। অল্প বয়সে দাঁতের গোড়া ও মাড়ি বন্ধ থাকে। দাঁতগুলিও থাকে নিরেট ও ধারালো। দাঁত ও মাড়ি বাঘের বয়স বুঝতে যথেষ্ট সাহায্য করে এছাড়া জঙ্গলে ব্যাঘ্রগণনা হয় বাঘের পায়ের ছাপ ধরে। সুন্দরবনের বাঘের গায়ের হলুদ-কমলা ও হলুদ-খয়েরি ডোরা কাটা দাগের এই অপূর্ব উজ্জ্বলতাকে এরা জঙ্গলের সঙ্গে মিশিয়ে রাখে। ফলে দু'হাত সামনে থেকেও অনেক সময় বোঝা যায় না এদের অবস্থান। এরা গোলপাতার ঝাড়ের ভেতরে থাকাটা খুব পছন্দ করে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে সুন্দর বনাঞ্চলের বাঘ কখনও বাতাসের বিপক্ষে এগোবে না; বাতাসের মুখোমুখি হয়েই এগুবে। যাতে তার গায়ের তীব্র বোটকা গন্ধ কেউ টের না পায়। টের পেলে আর তাকে সে শিকার করতে পারবে না। বাঘের লালায় থাকে উগ্র বিষ। শিকারের সময় মুখ নিঃসৃত এই লালা বেরোয় প্রচুর পরিমাণে। কারও গায়ে লাগলে চামড়ায় ঘা পর্যন্ত হয়ে যায়।

সুন্দরবনের বাঘ খুব গরম আবহাওয়া যেমন পচ্ছন্দ করে না, আবার তেমনই অতিরিক্ত ঠাণ্ডাও সে সহ্য করতে চায় না। সে জন্য নাতিশীতোষ্ণ জায়গায় সে সবসময় থাকতে ভালোবাসে। আর জল এরা পচ্ছন্দ করে। নদী-নালা সাঁতরে রাতের অন্ধকারে এরা নিঃশব্দে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে খাদ্যের খোঁজে। গ্রামবাসীর গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া তুলে নিয়ে আসে। এজন্য বনদপ্তর আজকাল জঙ্গলে খাদ্যের অভাব মেটানোর জন্যে 'শূকর পালন' শুরু করেছে। শূকরের গর্ভধারণ ক্ষমতা খুব ভালো। বছরে একসঙ্গে অনেকগুলো করে বাচ্চা হয়। ফলে এদের পালন করে বড় করে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাঘও এমন

খাদ্য পেয়ে জঙ্গল থেকে আর লোকালয়ের দিকে ছোটে না। সুন্দরবনে গোসাবার কাছাকাছি গোমর নদীর পাড়ে সজনেখালি **'ব্যাঘ্রপ্রকল্প'**-এর উল্টোদিকে বনদপ্তর এরকমই এক শূকর পালন প্রকল্প চালু করেছে আজ বেশ কয়েক বছর হল। 'ওয়েস্ট বেঙ্গল পিগারি' নামে এখনও সে প্রকল্প চালু আছে ওখানে।

ক্ষুধার্ত বাঘ জঙ্গলের কাঠুরে বা গাছকাটার দল বা মৌলেদের অর্থাৎ যারা মধু সংগ্রহ করতে বনে যায় তাদের আক্রমণ করে খেতে খেতেই 'ম্যান ইটারে' পরিণত হয়েছে। ফলে সভয়ে মানুষকে এড়িয়ে যাবার যে সহজাত প্রবৃত্তি আগে বাঘের ছিল এখন তা নেই।

মানুষ খেকো বাঘ যেখানে তার শিকার করে সেখানে সে খায় না। শিকারকে নির্জনস্থানে নিয়ে গিয়ে খেতে শুরু করে— যেখানে কোনও বিরক্তির কারণ থাকবে না। শিকারের সময় এরা বহুদূর থেকে শিকারকে লক্ষ্য করে। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়। কিন্তু শিকারকে বুঝতে দেয় না। কাছাকাছি গিয়ে লুকিয়ে থাকে। এরপর শিকার অর্থাৎ ধরা যাক, নদীতে জাল দিয়ে মাছ ধরতে ধরতে জেলে যখন অন্যমনস্ক হয়ে যায় তখনই পেছনে নিঃশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ঘাড় কামড়ে ধরে। তারপর তুলে নিয়ে চলে যায়। এমন নিঃশব্দে এই কাজ করবে যে কেউ কিছু বুঝতে পারবে না। আসলে শত্রুকে ছলনায় পরাস্ত করতেই এ অঞ্চলের বাঘ বড় ভালোবাসে। তখন তার চলা ফেরা ও লক্ষ্য এতই ক্ষিপ্র অথচ শব্দহীন যে দল নিয়ে জঙ্গলে গাছ কাটতে যাওয়া গাছকাটার

দলও বুঝতে পারে না যে আশেপাশে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে নিঃশব্দে লুকিয়ে রয়েছে তার মৃত্যু। আর লুকিয়ে থেকেই তাদের দলের সব থেকে অন্যমনস্ক লোকটিকে লক্ষ করে যাচ্ছে।

সুন্দরবনের বাঘের এই মনস্তত্বই পৃথিবীর অনান্য ব্যাঘ্রকূল থেকে তাকে আলাদা করে রেখেছে। তবে শুধুমাত্র একটি দিকেই সুন্দরবনের বাঘের দুর্বলতা। সেটি হল তার ঘ্রাণশক্তি। এদের ঘ্রাণশক্তি খুব প্রবল নয়। প্রখর দৃষ্টি আশ্চর্যজনক শ্রবণশক্তির পাশাপাশি যদি প্রবল ঘ্রাণশক্তিও তাদের থাকত তবে তারা আরও ভয়ংকর হয়ে উঠত। কিন্তু ঘ্রাণশক্তি তেমন না থেকেও এরা যেমন দুরন্ত ও ভয়ংকর তা কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ না করলে বোঝা যায় না। খানিকটা বোঝার জন্যই এবারে সত্যি ঘটনা সামনে রাখব।

এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ। বাতাসে ঝরঝরে শুকনো ভাব। আবাদ অঞ্চলের এক গ্রাম থেকে বিপিন সর্দার, শিবু দাস ও আরও দুজনকে সঙ্গে নিয়ে সজনেখালি বন দপ্তরে আসে মধু সংগ্রহের প্রয়োজনীয় অনুমতি পত্র নিতে। অনুমতিপত্র নিয়ে এরপর বিপিন সর্দার সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের পিরখালি ব্লকের ২ নং কম্পার্টমেন্টে যায় সামান্য কিছু জ্বালানি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। জ্বালানি মানে জঙ্গলের ভেতরে পড়ে থাকা শুকনো কিছু ডালপালা। ডিঙিটাকে পিরখালি খালের ধারে ভিড়িয়ে বিপিনরা জঙ্গলে ঢোকে। এদিক ওদিক ঘুরে জ্বালানি সংগ্রহ করে। তারপর পায়ে পায়ে বেরিয়ে আসে জঙ্গলের ভেতর থেকে। কিন্তু সবাই বেরিয়ে এসেছে কী আসেনি, ঠিক এমন সময় বিপিনের কানে 'আঁক্' করে ওঠার মতো একটা শব্দ ভেসে আসে। সঙ্গে সঙ্গে সে পেছনে তাকায়। আর তাকাতেই দেখে সঙ্গী শিবু নেই। আরও ভালো করে চারপাশে তাকাতেই এবার তার নজরে পড়ে দূরে জঙ্গলের ভেতরে শিবু দাসকে মুখে নিয়ে নিঃশব্দে সরে যাচ্ছে প্রকাণ্ড এক রয়্যাল বেঙ্গল। সুন্দরবনের বড় মিঞা। বিপিন ও তার সঙ্গী সাথিরা ততক্ষণে যে যেভাবে পারছে একসঙ্গে হাতের শুকনো ডাল দিয়ে জঙ্গলের গাছের গায়ে বারি মারতে শুরু করেছে। সেই সঙ্গে সবাই মিলে বিকট চিৎকার! এভাবে দু'তিন মিনিট যাওয়ার পর বাঘটি কী ভেবে মৃত শিবুর দেহটা ফেলে দিয়ে জঙ্গলের আরও গভীরে ঢুকে যায়। বিপিনরা তখন মৃত শিবুকে কাঁধে করে নিয়ে আসে। এবং তারপরেই নৌকায় তুলে চটপট নৌকাটা ছেড়ে দেয়। কিন্তু তখনই আবারই বাঘটি ফিরে আসে। এবং ডিঙি অনুসরণ করে ডিঙির পাশাপাশি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দ্রুত হাঁটতে থাকে। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর হাল ছেড়ে দিয়ে বাঘ জঙ্গলের ভেতরে চলে যায়।

সুন্দরবনের জঙ্গল থেকে গোলপাতা সংগ্রহ করাই সনাতন ঘোড়ুইয়ের পেশা। সনাতনের বয়স ৬০। তবে ৬০ হলেও মজবুত চেহারা। সুন্দরবনের গাছপালা, নদীনালা ও জন্তুজানোয়ার সম্পর্কে অগাধ অভিজ্ঞতা। একবার কার্তিক মাসের

শেষের দিকে সকাল ৮টা কী ৮-৩০ নাগাদ সনাতন তার সঙ্গীসাথিদের নিয়ে চামটা ব্লকের ৩ নং কম্পার্টমেন্টে গোলপাতা কাটছে। কাছেই দু'জন পাহারাদার রয়েছে বাঘের আগমনের খবরাখবর জানাবার জন্যে। হঠাৎ সনাতনের নজরে পড়ল দু'জন পাহারাদারের একজন নেই। নেই মানে! গেল কোথায়? সন্দেহ হওয়ায় আশেপাশে খোঁজ করতেই পাওয়া গেল জঙ্গলের ভেতরে খানিকটা রক্তের চিহ্ন। সনাতনের মাথা গরম হয়ে গেল। অন্য পাহারাদারকে নিয়ে একটু এগোতেই এরপর মিলল বাঘের পায়ের ছাপ। সনাতনের এরপর আর বুঝতে অসুবিধে হল না কী হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে একজন গুনিনকে সঙ্গে নিয়ে সদলবলে দৌড়ুলো জঙ্গলের ভেতরে। চিৎকার করতে করতে। এভাবে খানিকটা ভেতরে যেতেই চোখে পড়ল মৃত দেহটি। কিন্তু বাঘের কোনও দেখা নেই। কী ব্যাপার, বাঘ কোথায় গেল! সনাতন বুঝল, চিৎকারের শব্দে মৃত দেহটি রেখে বাঘ লুকিয়েছে কোথায়ও এবং কাছাকাছি যে আছে তাতে সন্দেহ নেই। সনাতন চারপাশে তাকাল।
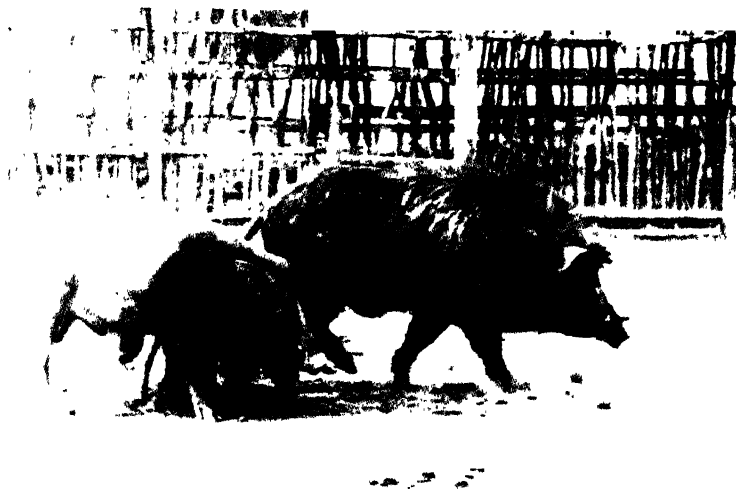
গুনিনের মুখে মন্ত্রের খই। বাঘের মুখ বন্ধ করাব বিপুল চেষ্টা চলছে তার মন্ত্রোচ্চারিত শব্দে। এভাবে মন্ত্র পড়তে পড়তেই গুনিন একসময় এগিয়ে গেল মৃত দেহটির কাছে। অমনি সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড গর্জন। মুহূর্তেই একটি হলুদ-কালো বিদ্যুৎ-রেখা ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে নিয়ে উধাও হল জঙ্গলের ভেতরে। এত দ্রুত, এত আচমকা, এত ক্ষিপ্রতা ও এমন-ভয়ংকর গর্জন করে মুহূর্তে

গুনিনকে তুলে নিল যে সনাতনদের মুখে কোনও কথা নেই। কিন্তু তাও শুধু মুহূর্তের জন্য। একটু পরেই প্রচণ্ড ভয়ে ও আতঙ্কে দলবলসহ সনাতনরা দৌড়ে এসেছিল জঙ্গল থেকে নদীর পাড়ে। জানা গেছে, যতদিন বেঁচে ছিল এরপর সনাতন আর জঙ্গলমুখো হয়নি। ঘুমে ও জাগরণে প্রতি মুহূর্তে শুধু সেই আতঙ্ক তাকে তাড়া করে বেড়িয়েছিল।

আগেই বলা হয়েছে, জঙ্গলে খাবারের অভাব ঘটলে বাঘ জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে লোকালয়ে হানা দেয়। সেজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনদপ্তর বেশ কয়েকবছর হল যেমন বাঘের খাদ্য হিসেবে শূকর পালনের ব্যবস্থা করেছে তেমনই জঙ্গলের মধু সংগ্রহের সময় বা গাছ কাটাদের সঙ্গে নকল মানুষ নিয়ে যাবার প্রচলন করেছে। এই সব নকল মানুষের শরীরে বৈদ্যুতিক তার জড়ানো থাকে। ভেতরে থাকে ব্যাটারি। বাঘ সেই নকল গাছকাটা বা নকল মধুসংগ্রাহককে আসল বলে যেই ধরতে যাবে তখনই শক খাবে। এতে বাঘের মধু সংগ্রহকারী বা গাছকাটাদের সম্পর্কে ভয় বাড়বে। ফলে আর আক্রমণ করবে না। কিন্তু দু'চার জায়গায় এই ব্যবস্থা চালু করেও তেমন ফল পাওয়া যায়নি। বুদ্ধিমান এই প্রাণীকূল অচিরেই জেনে গেছে মানুষের এই অভিসন্ধি। ফলে মানুষও আবার ভাবছে নতুন কোনও উদ্ভাবনী শক্তির।

শুধু এসব যেমন —বাঘের হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে যেমন নানান ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তেমনই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনদপ্তরের অধীনে Sundarban Biosphere Reserve বা সুন্দরবন জীবমণ্ডল সংরক্ষণ দপ্তর এই পশু কূলের রক্ষার দায়িত্বও নিয়েছে। এদের কথায় পরে আসছি। তারও আগে আর একটি বিষয় বলা দরকার। তা হল 'বাঘশুমারি'। অর্থাৎ মানুষের মতো বাঘেরও গণনার ইতিহাস। তার মানে এই প্রজাতির প্রাণীর সংখ্যা সুন্দরবনে বছর বছর বাড়ছে না কমছে তার সংখ্যাতত্ত্ব ও পরিসংখ্যানের হিসেব নিকেশ।

এই হিসেব নিকেশের ব্যবস্থা সুন্দরবনে প্রথম হয় প্রায় ২৫ বছর আগে। ১৯৭২ সালে। কেননা সে সময়ে চোরা গোপ্তা শিকার ও জঙ্গলের গাছ রাতারাতি চুরি হতে হতে দক্ষিণ বঙ্গের এই বনাঞ্চলের অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে অসম্ভব দুর্লভ এই প্রাণীটি প্রায় অবলুপ্তির দিকে চলে যাচ্ছিল। উক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের জন্ম। ১৯৭২ সালে সুন্দরবন ব্যাঘ্র-প্রকল্প প্রথম বাঘ শুমারির ব্যবস্থা নেয়। কিন্তু ম্যানগ্রোভের ঘন জঙ্গল, হাঁটার অযোগ্য আঠালো চোরা পাঁকাল মাটি, জঙ্গলের বাঘ-সাপ-কুমির ও বিষাক্ত মাছির দাপটে সেবারের মতো মাঝ পথেই বন্ধ করে দিতে হয় বাঘশুমারি। প্রকল্প তখন তাই নানা ধরনের পর্যবেক্ষন ও ভাবনা চিন্তার পর ১৯৭৬ সালে আবার ওই গণনার উদ্যোগ নেয়। আর গণনা শেষ করে দেখা যায় সেসময়ে বাঘের সংখ্যা ছিল ১৮১। ৪১৭০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ছড়ানো জলা-জঙ্গলের ২৫৮·৫

বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলকে 'কোর অঞ্চল' হিসেবে বেছে নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য ও ওয়াইল্ড লাইফ ফাণ্ডের যৌথ খরচে শুরু হয়েছিল ওই ব্যাঘ্র সংরক্ষণ। গণনার খরচও এই তিন পক্ষ দেয়। দু'দফায় সেবারে খরচ পড়ে প্রায় ১ কোটি টাকা। এরপর প্রতি দু'বছর অন্তর নিয়মিত ভাবেই শুরু হয় ওই বাঘশুমারি। ১৯৯২-৯৩ সালের সর্বশেষ বাঘশুমারির গণনায় দেখা যায় সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা ২৫১ এবং এর ভেতরে বাঘিনীর সংখ্যাই বেশি।

কিন্তু 'বাঘশুমারি' হয় কীভাবে! এ কথাটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার।

বাঘশুমারির ব্যাপারে বনদপ্তর যে পদ্ধতিতে বাঘের গণনা করে তাকে বলা হয় 'পাগ র্মাক'। এই পদ্ধতিতে লঞ্চ নিয়ে জঙ্গলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে নদীর পাড়ে নরম মাটিতে বাসি অথবা টাটকা বাঘের পায়ের ছাপ দেখলেই লঞ্চ থামিয়ে নেমে পড়েন বনদপ্তরের কর্মীরা। তারপর সন্তর্পণে ওই পায়ের ছাপে প্লাষ্টার অফ প্যারিস ঢেলে ছাঁচে তুলে নেওয়া হয় ছাপ। পরে ওই প্যারিস প্লাস্টার শুকোলে কাচের স্লাইডে ওই ছাপ এঁকে নেওয়া হয়। এই ছাপ অবশ্য পেছনের বাঁ পায়ের হওয়া চাই। যাই হোক, ছাপ যেখানে থাকবে বনদপ্তরের কর্মীরা সেখানকার মাটিও খানিকটা তুলে আনবেন। পরে সে মাটি পরীক্ষা করে বাঘের ওজন, শরীরের গড়ন, খাবার প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করে পরিচয় দেবেন বাঘের। সব শেষে কমপিউটারে গণনার শেষ পর্যায়। এই পদ্ধতিই 'পাগ মার্ক'। অবশ্য এই পদ্ধতিতে দু'বার একই বাঘের পায়ের ছাপ আসতে পারে। কিন্তু উপায় কী! বাঘ দেখে বা তার ডাক শুনে গণনা আর যেখানে হোক অন্তত সুন্দরবনে চলবে না। অন্য আর একটি পদ্ধতি অবশ্য আছে। সেটি ব্যাঘ্র-নিঃসৃত বর্জ্য পদার্থ পরীক্ষা থেকে বাঘের পরিচয় জানা। এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'ফেরোমেন' পদ্ধতি। কিন্তু সুন্দরবনের দুর্ভেদ্য ম্যানগ্রোভ ভেদ করে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে এই পদ্ধতিতে পরীক্ষা অসম্ভব। ফলে ভরসা বলতে ওই 'পাগ মার্ক'।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায়, সুন্দরবনের প্রতি ১০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা শাসন করে একটি বাঘ। আর শীতের প্রজনন মরশুম ছাড়া এলাকা ছেড়ে খুব একটা নড়ে না তারা। সেই হিসেবেই নির্দিষ্ট এলাকার বাঘকে খোঁজা হয়। আর মোট পরিসংখ্যান পাওয়ার পর একটা গড় হিসেবে বাঘের মোট সদস্যের সংখ্যাটা বের করা হয়।

সুন্দরবনের বনাঞ্চলে বাঘের পরেই আসে হরিণের কথা। এই হরিণ মোটামুটি দু' রকমের দেখা যায়। প্রথমটি বারকিং ডিয়ার বা ডাক-ওয়ালা হরিণ এবং অন্যটি স্পটেড ডিয়ার বা চিতল হরিণ।

বারকিং ডিয়ার বা ডাকওয়ালা হরিণ সুন্দরবনে অবশ্য কমই দেখা যায়। লোক সমক্ষে এরা প্রায় আসে না বললেই হয়। খাঁড়ি বা নদীর ধারে কদাচিৎ এদের দেখা যায়।

লেফটেন্যান্ট মরিসন তাঁর জরিপের পাওয়া গেল। নতুন এই জলপথকেহ

তৃষ্ণার্থ হরিণ : বর্তমান সুন্দরবনের সবচেয়ে আকর্ষণ

স্পটেড ডিয়ার বা চিতল হরিণ সুন্দরবনের সম্পদ। এদের গায়ে লাল-খয়েরি রঙের উপর পিঠে ও পিঠের দু'পাশে ছোট গোল পরিষ্কার শাদা দাগ। শিং থাকে শাখা-প্রশাখার মতো। সুন্দরবনের খাঁড়ি অঞ্চলে বা সমুদ্রের ধারে দলবদ্ধ হয়ে এদের ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। এরা সাধারণত ভীতু প্রকৃতির। কোনও রকম শব্দ হলেই কান খাড়া করে তাকিয়ে থাকে। পূর্ণবয়স্ক চিতলের শরীরের ওজন সাধারণত ১৫০ থেকে ২০০ পাউণ্ড পর্যন্ত হয়।

এই বনাঞ্চলের হরিণেরা কেওড়া গাছ দেখলে লোভ সামলাতে পারে না। দলে দলে এরা কেওড়া পাতা খেতে আসে। দীর্ঘ ও ঝাঁকালো এই গাছের মগডালে থোকা থোকা কেওড়া ফল হয়। খেতে টক। সেদ্ধ করে নুনে জারিয়ে নিয়ে এই অঞ্চলের গরীব মানুষদের ভাতের সঙ্গে এই ফল খেতে দেখেছি। হরিণদেরও প্রিয় ফল কেওড়া। একবার একটি হরিণকে কেওড়ার ফল মগডাল থেকে গলা তুলে খেতে দেখার সময় এক মহার্ঘ্য দৃশ্য দেখেছিলাম। পূর্ণবয়স্কা লম্বা মা-হরিণ কেওড়ার ডাল থেকে ফল খাবার চেষ্টা করছে। নিচে তারই বাচ্চা বাঁটে মুখ ডুবিয়ে মায়ের বুকের দুধ খাচ্ছে।
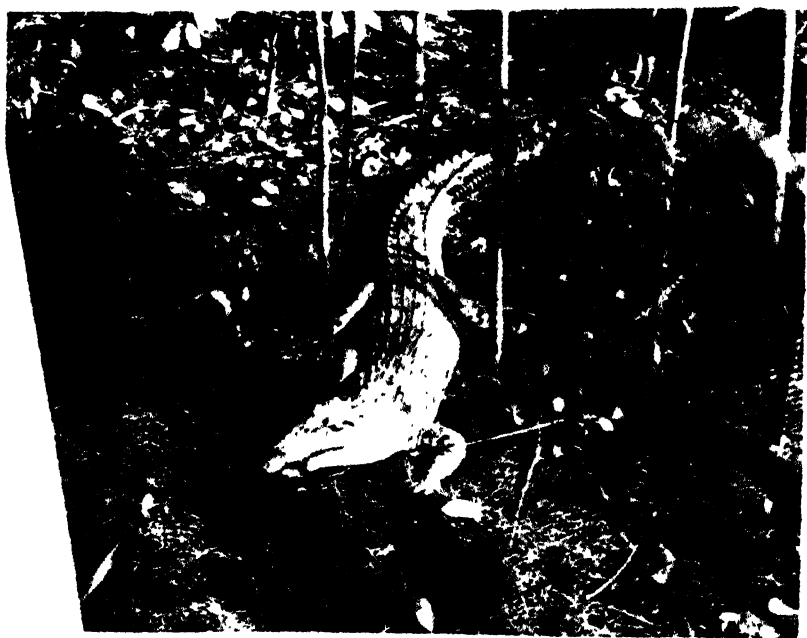
হরিণের পরেই যার কথা বলা দরকার সে হল **কুমির**। সুন্দরবনের কুমির পৃথিবী বিখ্যাত এবং ভয়ংকর হিংস্র। তিনের দশকেও সুন্দরবনের নদী নালায় প্রায় সর্বত্র কুমির ঘুরে বেড়াত সব সময়ই। কিন্তু এখন তারা আরও গভীরের দিকে ঢুকে গেছে। ঢুকলেও সুন্দরবনের সর্বত্র এখনও প্রচুর কুমির রয়েছে।

কুমির একটানা লম্বা গর্জন করে ডাকে। তবে সে ডাক খুবই কম শোনা যায়। শীতের ঋতুতে জোয়ারের জল যখন বাঁধের গায়ে উঠে আসে কুমির তখন বাঁধের গায়ে জলের উপরে মাথা রেখে তার লম্বা দেহের পেছন দিকটা জলের ভেতরে ডুবিয়ে আলস্যে চুপচাপ পড়ে থাকে। এদের ফ্যাকাশে মাটির মতো কর্কশ গায়ের রঙ আর মাটির রঙ একই রকম হওয়ায় হঠাৎ করে বোঝা যায় না। দূর থেকে মনে হয় যেন কোনও গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে। কুমির হিংস্র ও শিকার ধরতে ওস্তাদ। এরা কখনও পিছু হটতে জানে না। নোনা পানির কুমির তাই সমসময়ই সামনে এগুতে চায়। নদীর চিংড়ি ও কাঁকড়া কুমিরের প্রিয় খাদ্য।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সুন্দরবনের কুমিরের চাহিদা বাড়ায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনদপ্তর পাথর প্রতিমা থানার ভগবতপুরে **'কুমির প্রকল্প'** তৈরি করেছে। এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য হল সুন্দর বনাঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কুমিরের ডিম সংগ্রহ করে এনে তা থেকে বাচ্চা তৈরি করে বড় করা ও তার মাধ্যমে বিদেশী মুদ্রা অর্জন। যেভাবে তামিলনাড়ুতে ক্রোকোডাইল ব্যাঙ্ক তৈরি হয়েছে বা ওড়িশায় তৈরি হয়েছিল কুমির প্রকল্প ঠিক সেই ধারণা থেকেই পাথর প্রতিমা ব্লকের ভাগবতপুরে সুন্দরবনের কুমির প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে। এই প্রকল্প থেকে যেটা করা সম্ভব হয়েছে তা হল সুন্দরবনাঞ্চলে কুমিরের সংখ্যা বাড়ানো এবং প্রয়োজন মতো বড় করে সেগুলিকে অন্যত্র চালান করা।

কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে কী ভাবে এই বনাঞ্চলে কুমির ছানা জন্ম নেয় তা একটু খুলে বলা দরকার। তারও আগে বলা দরকার জঙ্গলে কুমির কোথায় ডিম পাড়ে এবং কীভাবেই বা সেই ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে বেরোয়।

সুন্দরবনের জঙ্গলে নদীর ধার থেকে মাঝে মাঝেই সরু সরু খাঁড়ি ঢুকে গেছে একেবারে জঙ্গলের ভেতরে এবং এই খাঁড়ি ধরে যতদূর পর্যন্ত জোয়ারের জল যায় ঠিক তার উপরের একটু ফাঁকা জায়গায়, উঁচু মাটিতে ডিম পাড়ে কুমির। ডিম পাড়ার জন্য সে নরম মাটিকেই বেছে নেয়। মাটি যতটা নরম থাকে তার চেয়েও বেশি নরম করার জন্য নির্দিষ্ট জায়গাটায় লেজ দিয়ে ছিটিয়ে ছিটিয়ে জল দেয়। তার উপর খাঁড়ির নরম কাদামাটি খানিকটা ছড়িয়ে দেয়। পরে আশ পাশ থেকে হেঁতালের পাতা কেটে এনে দাঁত দিয়ে কুচি কচি করে সেই কাদা মাটির উপর ছড়িয়ে রাখে। জায়গাটা উপযুক্ত হল কিনা এরপর সরেজমিনে দেখে মা-কুমির। দেখে নির্দিষ্ট সময়ে তারপর ডিম পাড়ে।

ডিম পাড়ার পরেই মা-কুমিরের দায়িত্ব বেড়ে যায়। যেভাবে ডিম পাড়ার জন্য উপযুক্ত জায়গা তৈরি করেছিল ঠিক সে ভাবেই আবার প্রচুর পরিমাণে কাদামাটি হেঁতাল পাতার কুচির সঙ্গে মিশিয়ে ওই ডিমের উপর মিশ্রিত লেই মাটি চাপিয়ে দেয়। একদিকে শুধু ছোট একটা ফুটো রাখে। দেখতে দেখতে

জিনিসটা একটা ঢিবির মতো উঁচু হয়ে ওঠে। আর এভাবেই একসময় কুমিরের বাসা তৈরি সম্পূর্ণ হয়। এবার যতদিন না ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয় ততদিন

ওই বাসাটিকে মা কুমির যক্ষের মতো পাহারা দেয়। ভেতরের তাপমাত্রা ঠিক রাখার জন্য লেজ দিয়ে বারবার সেখানে জল ছিটিয়ে দেয়। কখনও বাসার উপর উঠে শরীরের উত্তাপ দিয়ে ঢিবিটা গরম করে তোলে। এভাবে ৬০/৭০ দিন বাসা আগলে রাখার পর হঠাৎ ডিম ফাটার শব্দ পাওয়া যায়। শব্দ পেলেই বাসার মুখের সামনের ছোট্ট গর্তটার মুখে মুখ রেখে বসে থাকে মা কুমির। এই সময়ে একটা ঘটনা ঘটে। বাচ্চা ফুটে বেরুবার পর বাচ্চাগুলো তাড়াহুড়ো করে গর্তের মুখ দিয়ে বেরোতে চায়। আর ঠিক সময়ে নিজের বাচ্চাগুলোকে দেখার জন্য কুমির-মা যে গর্তের মুখের সামনে হাঁ করে বসে থাকে তা আগেই বলেছি। বাচ্চাগুলো তাড়াহুড়ো করে বেরোতে গিয়ে দু'চারটে দৌড়ে মা-কুমিরের মুখের ভেতরে ঢুকে যায়। এভাবে অজান্তেই কুমির তার কিছু বাচ্চা খেয়ে ফেলে।

বনদপ্তর কুমিরের এই গতি-প্রকৃতিকে ভালো ভাবে লক্ষ করেছে। দেখেছে বাসার ভেতরে একসঙ্গে এত ডিম কী করে থাকে। আর কতটা তাপমাত্রা পেলে সেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। জঙ্গলে যেভাবে বাসা তৈরি করে তাতে ডিম রাখে কুমির, বনবিভাগ ভগবতপুরে সেরকমই ঠিক কৃত্রিম উপায়ে বাসা তৈরি করে তাতে ডিম সংগ্রহ করে এনে তার তাপমাত্রা বাড়িয়ে কমিয়ে তবে ডিম ফোটাতে শুরু করেন। সাধারণত ডিম পেড়ে বাসা তৈরি সম্পূর্ণ হলে, যখন

মা-কুমির জঙ্গলে বাসার উপরের উঠে বসে বাসা গরম করতে থাকে তখন সে বাসার ভেতরের তাপমাত্রা থাকে ৩২°-৩° সে:। কৃত্রিম উপায়ে বাসা তৈরি করে বাসার ভেতরে ঠিক সে রকমই তাপমাত্রা রাখা হয়। প্রয়োজনে তাপমাত্রা বাড়ানো বা কমানোও হয় এবং প্রতি দু'ঘন্টা অন্তর সে তাপমাত্রা লিখেও রাখা হয়।

কাজটা প্রথমে কিন্তু এত সহজে হয়নি। প্রকল্পে হাত দেওয়ার পর, বনদপ্তর প্রাণপাত করে খুঁজেছে সুন্দরবনের নানা প্রান্তে কুমিরের ডিমের। কিন্তু খোঁজ করেও পায়নি। অবশেষে খোঁজ পাওয়া গেল। ১৯৭৬ সালের ২৪ জুলাই হেড়োভাঙায় হেতালের জঙ্গলে খোঁজ মিলল কুমিরের ডিমের। এরপরেই শুরু হয়ে যায় এ-প্রকল্পের কাজ।

প্রকল্পের ভেতরে বড় হ্যাচারি আছে। চারদিকে লোহার জাল দিয়ে ঘেরা। তারই ভেতরে বিভিন্ন উন্মুক্ত কম্পার্টমেন্ট। এক একটাতে এক এক বয়সের কুমির। আর একটাতে কৃত্রিম কুমিরের বাসা। ঠিক যেমন ভাবে জঙ্গলে ডিম পাড়ার সময় বাড়ি বানায় কুমির, ঠিক সেই রকম। একদিকে একটা বাঁশের নল লাগানো। ভেতরে, ফুটো দিয়ে থার্মোমিটার ঢুকিয়ে তাপমাত্রা নেওয়া হয় কুমিরের বাড়ির।

হ্যাচারির বিভিন্ন খোপের কুমিরকে ছোট চিংড়ি আর কাঁকড়া দেওয়া হয়।

প্রকল্পের একদিকে একটা ছোট মিউজিয়ামও আছে। ওখানে আছে কুমিরের

ডিমের খোলা। আকারে হাঁসের ডিমের চেয়েও একটু বড়। বাচ্চা ফুটতে গিয়ে মারা গেছে এমন একটি বাচ্চাও রাখা হয়েছে বোতলের ভেতরে ফরমালিন সলিউসনের ভেতরে।

এই প্রকল্প গড়ে ওঠার পর থেকে সুন্দরবনে কুমিরের সংখ্যা বেড়েছে। কেননা প্রাকৃতিক নিয়মে জঙ্গলে ডিম পাড়ার পর বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে যে সমস্ত ডিম নষ্ট হয়ে যেত বা বাচ্চা হওয়ার পর মা-কুমিরের পেটে গিয়ে কিছু বাচ্চা মরে যেত ডিম সংগ্রহ করে এনে প্রকল্পে রাখার ফলে সেগুলি আর উপরোক্ত কারণে নষ্ট হচ্ছে না। ফলে বন সম্পদ বাড়ছে।

সুন্দরবনের বন্যপ্রাণীর মধ্যে **বাঁদর ও শুয়োরের** পাশাপাশি আর একটি প্রাণী খুবই দেখা যায়। উগ্র ও দংশক এই প্রাণীটি সরীসৃপ। এ অঞ্চলের নদী-নালা, জল, জঙ্গল থেকে লোকালয়ে পর্যন্ত এই প্রাণীটির যাতায়াত সর্বত্র। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ এই বনাঞ্চলের আয়তন অনুযায়ী এত অধিক পরিমাণে বিষধর প্রাণী পৃথিবীর অনেক জায়গায়ই নেই। নানা প্রজাতির ফণাধারী কেউটে ছাড়াও **শঙ্খচূড়, চন্দ্রবোড়া, শাঁখামুটি বা শঙ্খিনী, শিকর চাঁদা, কালাচ, র‍্যাটেল ভাইপার, পাইথন** ও নানা জাতীয় সামুদ্রিক বিষধর সাপ দেখা যায় নিম্ন বঙ্গের এই গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলে। মানুষও মারা যায় প্রতি বছরই। মারা যাওয়ার কারণ প্রথমত দ্রুত সুচিকিৎসার অভাব ও ভয়ভীতির কারণে। সাধারণত এপ্রিল মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত নিম্ন বঙ্গ অধ্যুষিত সুন্দরবনে সাপের উপদ্রব দেখা যায় বেশি। মানুষও মারা যায় এ সময়ে বেশি। সবচেয়ে বেশি উপদ্রব দেখা কালাচের। একজন পরিণত মানুষকে কালাচ ছোবল মারলে, যদি ঠিকমতো বিষদাঁত ঢোকে তবে মানুষটির শরীরে বিষ ঢোকে ১.০ মি.গ্রা। আর তাতেই মানুষটির মৃত্যু হতে পারে না যদি সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্টিভেনিন সিরাম রোগীর শরীরে প্রবেশ করানো যায়। কিন্তু নদীনালার দেশে ৫৪ টি দ্বীপমালার বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের কাছে আজও এই ওষুধ দুর্লভ। তাই শুধু নয়— নদী-নালা, গাঁ-গঞ্জ পেরিয়ে সাইকেল ভ্যানে কিংবা নৌকায় করে রোগীকে নিয়ে দূরবর্তী কোনও হেলথ সেন্টারে পৌঁছুবার আগেই রোগী মরে যায়। আর একটি ব্যাপার হল, অজ্ঞ ও অশিক্ষিত গুনিন-পীর-ওঝার হাতে পড়ে বাঁচার সুযোগ থাকলেও বাঁচে না রোগী। এভাবে প্রতি বছরই অসংখ্য সাপে কাটা রোগীকে বিনা চিকিৎসায় মরতে হয়।

সাপের পাশাপাশি আছে গোসাপ। বা গুঁই সাপ। এরা সুন্দরবনের জঙ্গলে ছড়িয়ে আছে প্রায় সর্বত্রই। এদের চামড়া খুবই মূল্যবান। অনেক শৌখিন জিনিস তৈরি হয়। জঙ্গলে অনেকসময়ই চোরা শিকারীরা গোসাপ মারতে ঢোকে। কিন্তু সরকারের নির্দেশ আছে এই সাপ মারা বে-আইনী। ধরতে পারলে জেল পর্যন্ত হয়ে যাবে। কিন্তু নিষেধ সত্ত্বেও মাঝে মধ্যে তবুও গোসাপ মারা হয় লোক চক্ষুর আড়ালে।

গোসাপকে ভয় করে বিষাক্ত সাপেরাও। কেন না এদের খাদ্য হল জঙ্গলের অন্যান্য সাপ।

গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ সুন্দরবনে যাদের কথা না বললে এই অধ্যায়ই অসমাপ্ত থাকবে তারা হল বিচিত্র পাখির দল। এই পাখির দল জঙ্গলের পাশে খালের ধারে বসবাস করাই পচ্ছন্দ করে। এদের মধ্যে দেখা যায় **মাছরাঙা, চিল, চাতক, ফিঙে, গয়াল, মানিক, শামখোল, দুধরাজ, রক্তরাজ, ভীমরাজ** ও নানা **ধরনের বক**। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রজাতির মাইগ্রেটরি বার্ডও আছে। প্রতি বছরই নির্দিষ্ট একটি সময়ে এরা সুন্দরবনে চলে আসে। সাধারণত জুন-জুলাই মাসে এই সব মাইগ্রেটরি পাখিদের গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের কিছু কিছু অঞ্চলে আসতে দেখা যায়। আবার অনেকে আসে শীতের প্রাক্কালে। যখন হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চল বা সুদূর সাইবেরিয়া এলাকা বরফে ঢেকে যায় এই সব পাখিরা তখন স্থানান্তরিত হয়। তবে কিছু কিছু প্রজাতির বক, খাঁড়ি ও খালগুলি থেকে সারা বছর মাছ ও কাঁকড়া পাওয়ায় এবং পরিবেশ পচ্ছন্দ হওয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছে। থাকার জন্য এরা বেছে নেয় খাঁড়ি, খাল বা নদীর ধারের বড় বড় কেওড়া গাছগুলি। এখানেই ডিম ও বংশবিস্তার করে।

এছাড়া আছে সামুদ্রিক পাখি। ঝাঁকে ঝাঁকে এরা মাছের লোভে সমুদ্রোপকূলে উড়ে বেড়ায়। জম্বুদ্বীপে গেলে দূর থেকেই দেখা যাবে এমনই হাজার হাজার পাখি। জেলেদের বড় বড় ট্রলারের চারপাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। একবার এমনই ট্রলারে জম্বুদ্বীপ থেকে ফিরছিলাম। আমরা যতক্ষণ ট্রলারে ছিলাম আমাদের পেছনে পেছনে ট্রলারের মাথায় নীল আকাশে ওরা উড়ে আসছিল। সম্ভবত মাছ আছে মনে করেই ওরা আসছিল। কিন্তু আধঘন্টা এক নাগাড়ে ওড়ার পর তারপরে আবার ফিরে যায়। দেশি ও বিদেশী দু'ধরনের পাখিরই সমাবেশ ঘটেছে দক্ষিণবঙ্গের এই গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলে। এদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন সুন্দর শিস দেয় তেমনই কেউ কেউ নাকি আবার মানুষের মতো কথা বলে। অর্থাৎ কথা কাউকেই বলতে শোনা যায়নি, তবে গভীর জঙ্গলে ভীমরাজ পাখিরা যখন নিজেদের মধ্যে আলাপ করে তখন দূর থেকে শুনে মনে হয় যেন দু'জন মানুষ কথা বলছে।

বনজ সম্পদ

স্বাধীন ভারতের ৪১৭০ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলের নদীনালা ও খাঁড়ি সহ সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বনজ সম্পদ হিসেবে **সুন্দরী, গরান, গেওয়া, বানী, পশুর, গর্জন, কেওড়া, খলসি** ইত্যাদি ম্যানগ্রোভস্ ও **বাঘ, কুমির, হরিণ, বাঁদর, বরা, পাখি** ও **সাপ** ইত্যাদি বন্যপ্রাণীর কথা একটু আগেই বলেছি। এবং এই বনজ সম্পদ সমৃদ্ধ বনাঞ্চলের বাইরে আছে ৫৪ টি দীপমালায় নদী-নালা ও খাঁড়ি বিধৃত অঞ্চলের এক বিপুল জনবসতি। এই বসতির স্থায়ী বাসিন্দাদের

জীবিকা বলতে অরণ্যের বনজ সম্পদ, কাঠের তক্তা ও জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ। অথবা বাড়ি ঘর তৈরির কাজে তারা জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করে গোলপাতা ও হেঁতালের ডালপালা। এ ছাড়া আছে মধু।

মধু সমগ্র সুন্দর বনাঞ্চলের একটি শ্রেষ্ঠ বনজ সম্পদ। সহজ কথায় সবাই বলে 'মৌ' এবং যারা জঙ্গলে ঢুকে মধু আনতে যায় তাদের বলা হয় 'মৌলে'।

সুন্দরবনের স্যাঁতসেতে বনভূমিতে অতি ঘন ও দুর্ভেদ্য জঙ্গলে প্রতি বছর ইংরেজি মার্চ মাস [বাংলা চৈত্র/ বৈশাখ] থেকে জুন মাস [বাংলা আষাঢ় / শ্রাবণ] পর্যন্ত এক ধরনের মৌমাছিদের ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। এদের নাম **'এপিস ডরসাটা'** [Apis Dorsata] এরা। জঙ্গলের ভেতরে, সুন্দরবনের বৈচিত্র্যপূর্ণ বৃক্ষরাজির সুগন্ধ পুষ্পরাশির বুকে ঝাঁকে ঝাঁকে এই সময় নেমে আসে পরাগ আহরণে ও মৌচাক গঠনে। নানান সুগন্ধী ফুল থেকে মধু নিয়ে এসে চাকের কোষে কোষে জমা করে মধু। তবে সব গাছেই মৌমাছিরা চাক বাঁধে না।

সাধারণত যে সমস্ত বৃক্ষরাজি মৌচাক গঠনে সাহায্য করে তাদের পারস্পরিক শতকরা আনুপাতিক হার নিচে একটি সারনিতে দেখানো হলঃ

সারণি

বৃক্ষ	**শতকরা হার**
বাইন	১৬%
সুন্দরী	৯%
পশুর	২.৮%
গর্জন	১০%
গেঁওড়া	৩৯%
কাঁকড়া	৩.৫%
ধোন্দল	১.৯%
গরান	১১%
কেওড়া	৫.৩%
অন্যান্য	১.৫%

তবে মৌমাছিদের কাছে মৌচাক তৈরির জন্য সবচেয়ে যে বৃক্ষ পচ্ছন্দ, ক্রমানুসারে তা হল- ১] **গেঁওয়া** ২] **বাইন** ৩] **গরান** এবং ৪] **সুন্দরী**। অবশ্য নদী ও খালের একবারে ধারে অবস্থিত বৃক্ষরাজি মৌচাক তৈরির কাজে মৌমাছিরা ব্যবহার করে না। সাধারণত মৌমাছির ঝাঁক কোনও একটি গাছে কেবলমাত্র একটি মৌচাকই গঠন করে। শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ ক্ষেত্রে একটি গাছে দুটি মৌচাক দেখা যায়। বেশির ভাগ মৌচাকই ভূমি থেকে ২.৫ মিটার দূরত্বে তৈরি হয়।

সুন্দরবনে মধুর স্বাদ ঋতুভেদে আলাদা। বৈশাখ মাসে মধুর স্বাদ থাকে পাতলা। এই মধু অবশ্য কেওড়া ও বানী ফুলের। খলসে ফুলের মধু খুব ঘন। এক একটি মৌচাক থেকে যে পরিমাণ মধু পাওয়া যায় তার হিসেব নিচের সারণিতে দেখানো হল।

সারণি

মৌচাক প্রতি প্রতি ঘনফুট হিসেবে	**মধুর পরিমাণ**
১ ঘনফুট মৌচাক থেকে	৩ কি. গ্রাম
১.২৫ ,, ,, ,,	৪-৬ ,, ,,
১.৫ ,, ,, ,,	১০ ,, ,,
২ ,, ,, ,,	১৪ ,, ,,

এখন প্রশ্ন হল, মধু কী করে সংগ্রহ করা হয়!

আগেই বলা হয়েছে, মধু যারা সংগ্রহ করে তাদের বলা হয় 'মৌলে'। আর মধু আনার সময়কে বলা হয় 'মহল'। এই 'মহল' এর সময় পড়লেই নৌকা নিয়ে যাত্রা শুরু হয়। দলে তিন-চারজন মৌলে ছাড়াও থাকে একজন 'বাউলে'। 'বাউলে' মানে গুনিন। মৌলেরা সব সময়ই মধু আনতে যাওয়ার সময় সঙ্গে একজন বাউলে বা গুনিন নেয়। এই গুনিনের কাজ হল জঙ্গলে বাঘের হাত থেকে মৌলেদের রক্ষা করা। অর্থাৎ জঙ্গলে ঢোকার আগে গুনিন তার মন্ত্রের বলে বাঘের মুখ বন্ধ করে দেয়—যাতে বাঘ মৌলেদের উপর আক্রমণ না করে। এই বিশ্বাস দক্ষিণ বঙ্গের গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের প্রায় সমস্ত স্থানীয় মানুষের। আর সে বিশ্বাস থেকেই তারা গুনিন নেয় সঙ্গে। এই প্রসঙ্গে, গুনিন নিয়ে পরে আলোচনায় আসছি। আপাতত আমাদের বিষয় এখন মধু সংগ্রহের প্রক্রিয়া।

যাই হোক, গুনিন সঙ্গে নিয়ে মৌলের দল জঙ্গলে যাওয়ার আগে বনদপ্তরেরর অফিসে ঢুকবে। বনদপ্তরের অফিস বলতে **সজনে খালি টাইগার প্রজেক্ট**। মৌলের দল এখানে এসে উঠবে পারমিটের জন্য। জঙ্গলে যেতে অনুমতি লাগে সরকারের। এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনদপ্তরই সে অনুমতি দেয়। মাথা পিছু ১ কুইন্টাল মধু ও ১৫ কিলোগ্রাম 'মোম'-এর জন্য একমাসের পারমিট দেওয়া হয়। ১০ টাকা কিলো হিসেবে ১ মাসের ১ কুইন্টাল মধুর পারমিট ফি ১০০০ টাকা। ১৩ টাকা কিলো হিসেবে ১ মাসের ১৫ কিলো মোমের পারমিট ফি ১৯৫ টাকা। বিক্রয় কর ৮%। [এই পরিসংখ্যান ১৯৯১ সালের। বর্তমানে এর সামান্য হেরফের ঘটতে পারে] কিন্তু এই নিয়মেরও ব্যাতিক্রম ঘটে। অনুমতি ছাড়াও লুকিয়ে অনেকে জঙ্গলে ঢোকে। আর যাঁরা সরকারি পারমিট নিয়ে জঙ্গলে যায়, পারমিটের সিঙ্গেই প্রজেক্ট অফিস থেকে মৌলেদের দেওয়া হয় ৩০ কিলো

মধু ধরে এমন কয়েকটি জ্যারিকেন আর একটি করে মুখোশ। প্রত্যেক মৌলে এই মুখোশ মাথার পেছনে লাগিয়ে নেয়। কেননা বাঘ সমসময়ই পেছন থেকে আক্রমণ করে। আর পেছনে মুখোশ থাকায় বাঘ ভাবে লোকটি বুঝি তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাই আক্রমণ করতে পারে না।

জঙ্গলে ঢোকার সময় মৌলেদের হাতে থাকে বড় বড় টিন বা হাড়ি। আর থাকে শুকনো ও কাঁচা হেতাল পাতার মশাল। আর সেই সঙ্গে চটের বস্তা ও ধারালো দা। জঙ্গলে ঢোকার মুখে গুনিনের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ শেষ হলে, আগে আগে গুনিনকে রেখে মৌলের দল ঢুকবে জঙ্গলে। তারপর 'মাল'-এ পৌঁছে চাক খোঁজা শুরু হবে। 'মাল' হল জঙ্গলের ভেতরে যতটা এলাকা নিয়ে মধু সংগ্রহ করা হবে সেই এলাকার স্থানীয় নাম।

তা মালে পৌঁছে চাক দেখে মৌলেদের একজন হেঁতালের মশালটা জ্বালিয়ে নেবে। আর একজন চটের বস্তাটা মাথার ভেতর দিয়ে গলিয়ে জামার মতো পরে নিয়ে কাস্তে হাতে দাঁড়াবে। তারপর জ্বলন্ত মশালটা যার হাতে ছিল সে সেই মশালটা ধরবে মৌচাকের নিচে। মুহূর্তেই ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি বেরিয়ে আসবে চাক ছেড়ে। কিন্তু মশালের ধোঁয়ায় রাস্তা খুঁজে না পেয়ে পালাতে থাকবে জঙ্গলের ফাঁক ফোঁকর দিয়ে। ততক্ষণে গাছে উঠে দা চালিয়ে চাকটা কেটে নিয়েছে প্রথমজন। নিচে হাঁড়ি বা টিন হাতে যারা দাঁড়িয়ে থাকবে তারা তখন চাকের মধু হাঁড়ি বা টিনে ভরতে থাকে। এভাবে বেলা গড়িয়ে পড়ার আগে আবার

মৌলের দল মধু নিয়ে জঙ্গল ছেড়ে বেরোবে। বেরিয়ে যাবে আবার জঙ্গল দপ্তরের অফিসে। কেননা জঙ্গল থেকে সংগৃহীত মধু ও মোম সরকারি অফিসই কিনে নেবে।

সরকারি তরফে পারমিট দেবার সময় মধুর জন্য কিলো প্রতি জমা রাখতে হয়েছিল ১০ টাকা। আর সরকারি তরফে তা কেনার দাম ২৪ টাকা। মোমের জন্য জমা মূল্য কিলোপ্রতি ১৩ টাকা এবং কিলোপ্রতি এর ক্রয়মূল্য ২৮ টাকা[১৯৯১ এর সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী]।

কেবলমাত্র মধুই নয়, জঙ্গলে কাঠ কাটতে গেলেও সরকারি তরফে অনুমতি দরকার। সুন্দরবনের জঙ্গলের প্রধান বনজ সম্পদ হল কাঠ। এই কাঠ কাটার জন্য বছরে দু'বার সরকারি অনুমতি দেওয়া হয়। ফেব্রুয়ারি-মার্চ এবং অগাস্ট -সেপ্টেম্বর। অনুমতি বনদপ্তরের সজনে খালি টাইগার প্রজেক্টই দিয়ে থাকে। একটি নৌকায় কী পরিমাণ কাঠ কেটে আনা হবে তার উপরই নির্ধারিত হয় নৌকার লাইসেন্স ফি। যেমন—

সারণি/ক

১ থেকে ১০ কুইন্টাল কাঠের নৌকার জন্য ফি = ২.২৫ টাকা
১০..,,...২০...,,...,,...,,...,,...,,... = ৩.০০... ,,
২০...,,...৪০...,,...,,...,,...,,...,,... = ৪.৫০... ,,
৪০... ,,.. ১২০... ,,...,,...,,. ,,... ,, = ৬.০০... ,,
১২০... ,,... ২০০...,,... ...,,...,,..., = ৯.০০...,
২০০...,,...৪০০...,,..., ,,...,,..., = ১৫.০০...,
৪০০...,,.. ৪০০-এর উপরে..,,...,,...,,..., = ২২.৫০..

এ তো গেল নৌকার লাইসেন্স। কিন্তু কাঠের জন্যও একরকমের পারমিট ফি দিতে হয়। যেমন—

সারণি/খ

কাঠ	প্রতি কুইন্টাল
গরান	১৫ টাকা
বাইন	৮ ,,
গর্জন	৬ ,,
গেঁওয়া	৮ ,,
কেওড়া	৮ ,,
জ্বালানি কাঠ	১০ ,,

১৯৯১ সালের প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী।

এ ছাড়া পারমিট ও লাইসেন্স ফি-র উপর রয়েছে ৮ শতাংশ বিক্রয়কর। তবে মধু কিংবা মোমের মতো সরকারি তরফে কোনও কাঠ কেনা হয় না। পারমিট সাপেক্ষে জঙ্গলের কাঠ কেটে এনে তাই বাইরে বিক্রি করা যায়। সে কারণে বড় বড় ব্যবসায়ী ছাড়া কাঠ কাটার পারমিট কেউ পায় না। সব গাছের ক্ষেত্রেই পারমিট মেলে শুধু ওই সুন্দরী বৃক্ষ ছাড়া। কেননা অবিভক্ত ভারতবর্ষের সুন্দরবনে যে পরিমাণ সুন্দরীবৃক্ষ ছিল, বিভক্ত ভারতের সুন্দরবনাঞ্চলের ভাগে সুন্দরীবৃক্ষ খুব কমই চোখে পড়ে। সে কারণে সুন্দরীবৃক্ষ কাটায় এত নিষেধাজ্ঞা। তবে জঙ্গলে গাছ কাটার পারমিট দেওয়া হয় সে সমস্ত গাছের, যে সমস্ত গাছের বয়স হয়ে গেছে। বন দপ্তরের কর্মীরা জঙ্গলে ঢুকে গাছ দেখে লাইন কেটে মার্কা মেরে দেবে। তবেই না সে গাছ কাটতে পারবে গাছ কাটাররা। অবশ্য নিয়ম যেমন আছে তেমনই বে-নিয়মও তৈরি হয়েছে এই নিয়মের উৎস থেকেই। মধু, মোম ও কাঠের ক্ষেত্রেও তাই দেখা যায় বে-নিয়ম। অর্থাৎ বন দপ্তরের পারমিশান ছাড়াই দেদার চুরি হচ্ছে মধু, মোম আর কাঠ। আবার বাইরে সেগুলি কেনার জন্য আড়তদারও থাকছে বসে। তবে চোরাই কাঠ প্রায়ই ধরা পড়ে বন দপ্তরের ফরেস্ট গার্ডদের হাতে। তখন কাঠ বোঝাই নৌকাসহ ধরে আনা হয়। এনে সেগুলি 'সীজ' করাও হয়। পরে এ-সমস্ত কাঠই নিলামে বিক্রি হয়।

সামুদ্রিক সম্পদ

অফুরন্ত বন সম্পদের পাশাপাশি সামুদ্রিক সম্পদও ছড়িয়ে আছে এ অঞ্চলের প্রকৃতির ভাঁড়ারে। এ-প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় মাছের কথা। **পারসে, ভাঙন, কলাগাছি, রাম-পারসে, আধা-ভাঙন, ভেটকি, তোপসে, গুরজাউলি, ভোলা, আড়, বিরন-ফিশ, বোম্বে-ডাক, প্রমফেট, ইলিশ, তেল-চিত্রা, ম্যাকারেল, শেলে, চক্ষুরতন, শিমুল-কাঁটা, মেদকাঁটা, সোনাকাঁটা** ইত্যাদি কত রকমই না নাম; আর চিংড়ি। চিংড়ির মধ্যে **বাগদা, গলদা, চাপড়া, হেঁড়ে, চামনে, মধু ও রসনা চিংড়ি।**

কিন্তু এই সম্পদকে সমুদ্র থেকে তোলার জন্য কতই না প্রচেষ্টা। আর সে প্রচেষ্টায় ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষ আজ আরও আধুনিকিকরণের কথা ভাবছে এ প্রচেষ্টার। পাশাপাশি সরকারি ব্যবস্থাও বসে নেই।

সমুদ্রে মাছ ধরার জন্যেও সরকারি অনুমতি লাগে। লাগে নৌকার লাইসেন্স ফি। মাথাপিছু প্রতি সপ্তাহে মাছ ধরার জন্য পারমিট ফি লাগে ২.০০ টাকা। বিক্রয় কর ৮ শতাংশ। অর্থাৎ ৩ জন জেলে যদি নৌকায় থাকে এবং যদি ৪ সপ্তাহের পারমিট পান তাহলে দিতে হবে ২৪ টাকা। এরপর মাছের পরিমাণ অনুযায়ী লাইসেন্স ফি।

যন্ত্রচালিত নৌকার সাহায্যে, সামুদ্রিক সম্পদের সন্ধানে জেলেরা গভীর সমুদ্রে

চলে যায়। উপকূল থেকে প্রায় ৪০০-৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত ভেতরে ঢোকে। পূর্বদিকে বাংলাদেশ বর্ডার থেকে পশ্চিমে পারাদ্বীপ পর্যন্ত মাছ ধরা হয়। তখন ওই বড় বড় নৌকাই জেলেদের ঘর বাড়ি। এবং ওখানেই চলে থাকা, খাওয়া ও ঘুম। নৌকার খোলে থাকে মজুত বরফ। মাছ ধরা হলে বরফ চাপা দিয়ে রাখা হয় সঙ্গে সঙ্গে। তবে সমুদ্রের মাছ ধরার জন্য যেমন জেলেদের আদব-কায়দা অন্য রকম থাকে জেলেদের— তেমনই জাল, নৌকা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিকও থাকে অন্যরকম। সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য জেলেরা বিভিন্ন ধরনের জাল ব্যবহার করে। যেমন **ব্যাগ-নেট, গিল-নেট**। ব্যাগ-নেট দেখতে অনেকটা মোজার মতো। ট্রলার থেকে এই জাল প্রথমে সমুদ্রে ফেলা হয় এবং ধীরে ধীরে জালকে সমুদ্রের গভীরে যেতে দেওয়া হয়। জাল নিচে নেমে গেলে ট্রলার চলতে শুরু করে। আর ট্রলারের পিছু পিছু ব্যাগ-নেট ফোলানো বেলুনের মতো বিশাল গহ্বর নিয়ে আসতে থাকে। জলের মাছ অত বোঝে না। ফাঁকা জায়গা পেয়ে ঢুকে যায় ওই জালের ভেতরে কিন্তু বেরোতে পারে না। আর ট্রলারও খানিক পরে কপিকলের সাহায্যে ওই জাল তুলে মাছ বের করে নেয়। গিল-নেট আবার যন্ত্রচালিত নৌকা থেকে জলে ফেলা হয়। অনেকটা পরিধি নিয়ে এই জাল জলে নেমে যায় এবং নির্দিষ্ট সময়ে পরে যন্ত্রের সাহায্যেই আবার ধীরে ধীরে গুটিয়ে নেওয়া হয়। এভাবেই প্রতিদিন জল থেকে তোলা হচ্ছে প্রায় ৩০।৪০ টন সামুদ্রিক সম্পদ।

পশ্চিমবঙ্গে সমুদ্রে মাছ ধরা প্রধানত **ক্যানিং, নামখানা, কাকদ্বীপ ও দীঘা** এই ক'টি জায়গার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই সব অঞ্চলে ভৌগলিক কারণেই তাই এই মাছ ধরার জীবিকা ও ব্যবসা গড়ে উঠেছে। কাকদ্বীপ ও নামখানা অঞ্চলে যে কোনও মাছ ধরা নৌকাকেই ট্রলার বলা হয়। কিন্তু ট্রলার শুধু যন্ত্রচালিত নৌকা নয়। দেখতে প্রায় একই রকম হলেও ট্রলারে জাল ফেলা ও জাল তোলা হয় যন্ত্রের সাহায্যে। কাকদ্বীপ ঘাটে দাঁড়িয়ে এ-বিষয়েই জিজ্ঞেস করছিলাম এক পঞ্চায়েত সদস্যকে। যিনি এই ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এই যে এত আয়োজন—এর জন্য কত বিনিয়োগ করতে হয়।' বলছিলেন, 'তা ধরুন নামতে হলে ১০-১২ লাখ টাকা লাগে। 'হিসেবটা কীরকম!' জিজ্ঞেস করতেই জানিয়েছিলেন, 'ধরুন যে ট্রলারটা নিয়ে সমুদ্রে যাবেন তার পেছনে বানাবার খরচ এখন থেকে ছ থেকে সাত লাখ। তবে যেমন-তেমন জালে হয় না।' জাপানি কর্ড-এর জাল চাই। তার জন্য খরচ দু-আড়াই লাখ; এ-ছাড়া অন্যান্য সরঞ্জাম, জেলেদের সঙ্গে চুক্তি ইত্যাদির জন্য আরও **তিন থেকে চার** লাখ টাকা ওয়ার্কিং-ক্যাপিটাল। এত টাকা, এত পরিশ্রম সবই ঢালতে হয় জলের ভেতরে।'

'কেন, লাভ হয় না বলছেন?' প্রশ্নটা ছুঁড়েই কুঞ্চিত চামড়ার ওপর টুপি

বসানো মুখের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করেছিলাম।'

পঞ্চায়েত সদস্য জানালেন, 'না না, আগের থেকে তো এ ব্যবসা নিশ্চয়ই এখন লাভজনক। তাই বিনিয়োগকারীর সংখ্যা বাড়ছে। সমবায়ের মাধ্যমে বিনিয়োগও বাড়ছে। বিদেশী বিনিয়োগও বাড়ছে। ব্রিটানিয়া, ইউনিলিভার, আই টি সি-র কোম্পানিরাও আগ্রহ প্রকাশ করছে। তবে সমস্যাও আছে। যেমন জাল ছিঁড়ে যাওয়া। কেননা অন্যান্য সবকিছুর উপর বীমা থাকলেও জালের উপর কোনও বীমা নেই। তাছাড়া আছে জলদস্যুদের হামলা।

হ্যাঁ, এই সমস্যাটি সামুদ্রিক অঞ্চলে জেলেদের প্রায়ই মোকাবিলা করতে হয়। জলদস্যুরা কাছাকাছি কোনও অঞ্চলের হয়। হয়ত ঝড়জলের জন্য কোনও ট্রলার সুন্দরবনের কোনও খাঁড়ি অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছে বা মাছ ধরে ফিরছে, সুবিধেজনক কোনও জায়গায় পেয়েই জলদস্যুদের দল এদের উপর হামলা চালায়। দেশি তরোয়াল ও বন্দুক নিয়ে এদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েই জলদস্যুদের দল ট্রলারগুলির দখল নেয়। দু'একজন ট্রলারের জেলেকে **দাবি ফর্দ** দিয়ে ছেড়ে দেয়। তারা এসে উপকূলে পৌঁছেই জানিয়ে দেয় যে জলদস্যুরা মূল ট্রলারগুলিকে আটকে রেখেছে। অনেক সময় মোটা টাকার মুক্তিপণও দাবি করে এই জলদস্যুরা। এবং দিতেও হয় অনেক সময় চাপে পড়ে। এরকমই এক ট্রলার মালিক কিছুদিন আগে প্রায় ৫০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে এনেছেন তার দু'দুটো ট্রলারকে। এ ছাড়া আছে আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এই দুর্যোগে প্রতিবছরই কিছু না কিছু ক্ষতি হয়। প্রাণহানি ঘটে। নৌকা ডোবে। তবে এই জীবিকা নিয়ে প্রাণহাতে রোজই যারা সমুদ্রে যায় তাদের কাছে এগুলি অবশ্য আর পাঁচটা ঘটনার মতো। আসলে জীবিকার প্রয়োজনে লড়াই এদের আজ জীবনসঙ্গী। তাই মৃত্যু ততটা বিচলিত করে না এদের। যদিও সরকারি তরফে নথিভুক্ত মৎসজীবিদের জন্য চালু হয়েছে জীবনবিমা। কিন্তু এখনও তা সর্বস্তরে ঠিক সহজলভ্য হয়ে ওঠেনি।

মাছ ছাড়াও সমুদ্র থেকে আরও একটি লাভজনক জিনিস পাওয়া যায় তা হল **'ফিশ-মিল'**। **ফিশ-মিল** হল মাছের খাবার তৈরির জন্য সমুদ্র থেকে পাওয়া বিভিন্ন ধরনের ছোট মাছ ও সামুদ্রিক পোকার সংমিশ্রণ। এজন্য ছোট সামুদ্রিক মাছ, বিভিন্ন রকম সামুদ্রিক পোকা ধরা হয় সমুদ্র থেকে। এই ব্যবসাও লাভজনক। একই সঙ্গে মাছ ধরার সঙ্গে সঙ্গে এগুলিও তোলা হয়। কিন্তু লাভ দেখতে গিয়ে ভবিষ্যতে সামুদ্রিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। কেননা অতিরিক্ত পরিমাণে **'ফিশ-মিল'** সমুদ্র থেকে তুলতে তুলতে একদিন দেখা যাবে সামুদ্রিক এই সব ফিশমিলের অভাবে মাছেরা না খেতে পেয়ে জলের ভেতরে মরে যাচ্ছে। দলে ভবিষ্যতে মাছের পরিমাণও এতে চলে যাবে। এখন থেকে সতর্ক না হলে আগামী শতকে যে সামুদ্রিক

ভাঁড়ার শূন্য হবে না তা কে বলতে পারে।

সুন্দরবনের সমুদ্র সম্পদকে সমৃদ্ধ করেছে আরও যে দুটি প্রাণী যাদের কথা না বললে এই অধ্যায় সম্পূর্ণ হবে না— তাদের প্রথমটি হল **কচ্ছপ** ও দ্বিতীয়টি **কাঁকড়া।**

দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের মোহনা থেকে নানা প্রজাতির **কচ্ছপ** মাতলা, ঠাকুরাণ, গোসাবা, সপ্তমুখী ইত্যাদি এই সব নদীর গভীর জলে ঘোরাফেরা করে। এদের কোনও কোনও প্রজাতি **প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর** ও **অতলান্তিক** মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে বছরে তিন চারমাসের জন্য হলেও হাজার হাজার কিলোমিটার জলপথ পাড়ি দিয়ে আসে। আবার নির্দিষ্ট সেই পথেই চলে যায়। আশ্চর্য, কী অদ্ভুত এদের নিশানা। জলের ভেতরে হাজার হাজার কিলোমিটার পথ চিনে তারা নির্ভুলভাবে যাতায়াত করে। এরা আসে। এদের কোনও কোনও প্রজাতি আবার যাওয়ার আগে সুন্দরবনের কোনও কোনও বালিয়াড়িতে ডিম পেড়ে যায়। সে ডিম থেকে আবার বাচ্চা ফোটে।

ভারতীয় সমুদ্রোপকূলে পৃথিবীর সাতরকম প্রজাতির কচ্ছপের মধ্যে প্রায় পাঁচটি প্রজাতিরই সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে বেশি সংখ্যায় সুন্দরবনে দেখা যায় অতলান্তিক থেকে আসা **অলিভ রিডলে।** হাজার হাজার কিলোমিটার জলপথ দ্রুত সাঁতরে পার হওয়ার জন্য এদের চারটে পাখা আছে। কিন্তু পা নেই। তাই বুকে হেঁচড়ে হেঁচড়ে নিজের শরীরটা এরা জল থেকে তুলে বালিয়াড়িতে এগোয়। তারপর ডিম পাড়ার জন্য পাখনা দিয়ে পছন্দ সই জায়গায় বালি সরিয়ে সরিয়ে এরা ৫০ থেকে ৭০ সেমি পর্যন্ত গর্ত খোঁড়ে। সেই গর্তের ভেতরে প্রায় শতাধিক ডিম পাড়ে একসঙ্গে। পরে পাখনা দিয়েই আবার সেই গর্ত বুজিয়ে দেয়। গর্তের ভেতরে পড়ে থাকে শতাধিক ডিম। কিন্তু বাচ্চা ফোটার জন্য আর অপেক্ষা করার সময় নেই তাদের। ডিম পেড়েই আবার হাজার হাজার কিলোমিটার জলপথ পাড়ি দিয়ে চলে যায়।

সাধারণত ৫৫ থেকে ৬০-৬৫ দিন পর ছোট ছোট কালো, হাতের ঘড়ির ডায়ালের মতো সাইজের বাচ্চা, বালি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে। বেরিয়েই নোনা জলে নেমে, নদী হয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে মহাসাগরে যাত্রা করে। এরাই আবার বড় হয়ে, গর্ভধারণ করে— ডিম পাড়ার জন্য হয়ত বুকে হেঁচড়ে একদিন এই সুন্দরবনে চলে আসবে। এরা পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় ৫০-৬০ কিলোগ্রামের পর্যন্ত হয়ে থাকে। সমুদ্রে বড় বড় ট্রলারের জালে এরা প্রায়ই বন্দি হয়ে পড়ে। অনেকসময় জাল টানা-হ্যাঁচড়ায় এরা মারাও যায়। আবার কখনও কখনও এদের শরীরের ওজনে জালের তার ছিঁড়েও যায়। অনেকসময় জেলেদের জালে এই প্রজাতির কচ্ছপ উঠলে জেলেরা সেগুলি জলে ছেড়েও দেয়। কেননা কচ্ছপ মারা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ১৯৭৪ সালে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী এ-ব্যাপারে

বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবুও, আগেই বলেছি, আইন থাকলেও আইনের ফাঁকও আছে। তাই দুর্লভ এই প্রাণীর রক্ষণাবেক্ষণে কেবলমাত্র আইন নয়, স্থানীয় মানুষকেও এ-ব্যাপারে সচেতন করে তুলতে হবে। কেননা সুন্দরবনে এসে এরা আজ নানা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। যেমন গর্ভধারণ করে হাজার হাজার কচ্ছপ জলতলদেশে জেলেদের জালের বাধা পাচ্ছে। বাধা কাটিয়ে বঙ্গোপসাগরের মোহনায় এসে যদিও বা উঠল তো নদীর পাড়ে এসে বা দ্বীপের

চড়ায় ডিম পাড়ার জন্য উঠতে গিয়ে মানুষেরই নজরে পড়ে বন্দি হচ্ছে। অথবা কোনও রকমে ডিম পেড়ে পালালেও বুনো শূকরের উৎপাতে সে ডিম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অথবা বাচ্চা ফুটে বেরোবার সময়ই **চিল, দাঁড়কাক, গাংচিল, ফিসিং-ক্যাট** ও অন্যান্য শত্রুর আক্রমণে এরা মরে যাচ্ছে। এ রকম চললে এমন একদিন আসবে যখন মহাসাগরীয় অঞ্চলের এই বাসিন্দারা গর্ভধারণ করে ডিম পাড়তে আর সুন্দরবনে আসবে না। অথচ এদেরও সংরক্ষণ করা যায়। যদি যথার্থ পর্যবেক্ষণের পর যে সব জায়গায় এবং যে-সময়ে এরা ডিম পাড়ে যেসব জায়গায় নজরদারি রাখা হয় ও পরে **'কুমির-প্রকল্পের'** মতো সেই ডিম সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় তা ফুটিয়ে বাচ্চা বের করে নোনা জলে ছেড়ে দেওয়া যায়। অবশ্য এ কর্মসূচি নেওয়া যে হয়নি তা নয়। তবে আরও বেশি ভাবে হওয়া প্রয়োজন এবং এ-জন্য প্রচুর অর্থ দরকার। যেখানে সরকার উন্নয়নের পেছনে টাকা খরচ করতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে সেখানে রাজ্য সরকারের

একার উদ্যোগে এসব করা সম্ভবপর হয়ে উঠছে না। দরকার এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য। আর সবচেয়ে বেশি চাই যা—তা হল উদ্যোগ। যিনি এ-ব্যাপারে উৎসাহী, যার মধ্যে গবেষণার মনোভাব আছে, যিনি প্রাণ দিয়ে এসব ভালোবাসেন খুঁজে পেতে তাদেরই এ কাজে লাগাতে হবে। তবেই এ ধরনের উদ্যোগ সার্থক হবে।

সুন্দরবনের সমুদ্র-সম্পদের আর একটি হল **কাঁকড়া**। কাঁকড়ার প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে একটি ঘটনার উল্লেখ করি।

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। বকখালি অঞ্চলে সকালের দিকে ঢুকে পড়েছি। লোকজনের ভিড় তেমনও হয়নি তখনও। কথা ছিল, বকখালি থেকে আমরা চারজন পাতিবুনিয়া ফরেস্ট দেখে যাব এগারো মাইলের মোড়ে। ওখান থেকে যাব হরিপুর। হাতে তেমন সময় ছিল না। তবু তারই ভেতরে একবার বালিয়াড়ি পার হয়ে বকখালি সী-বিচে নেমে পড়লাম। বেলা তখন ক'টা? বোধহয় ন'টা সাড়ে ন'টাই হবে।

বীচে নেমেই কিন্তু চমকে উঠলাম। এ কি! সমস্ত বীচটাই যতদূর চোখ যায়, শুধু লাল আর লাল। বীচের উপরে এত লাল রঙ এল কোত্থেকে! আমাদের সঙ্গে ছিল হরিপুরের প্রফুল্ল দাস। প্রফুল্লর ট্রলার আছে। সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। হেসে আমাকে বলল, 'দাদা সামান্য একটু গিয়ে একটা বড় করে হাত তালি দিন, দেখবেন সব আবার সাদা হয়ে গেছে। গোটা বীচটাই আবার ধবধবে সাদা।'

বললাম, 'মানে'!

প্রফুল্ল বলল, 'মানে পরে হবে দাদা—আগে একটা বড় করে তালি দিন না, একটু এগিয়ে গিয়ে।'

প্রফুল্লর কথায় একটু এগিয়েই বড় একটা হাত তালি দিলাম। দূরের ঝাউয়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে সে তালি আবার প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল। আর তখনই অবাক। গোটা বীচটাই মুহূর্তে সাদা। কী হল। অবাক হয়ে প্রফুল্লর দিকে তাকাতেই প্রফুল্ল হেসে বলল, 'ও গুলো দাদা কাঁকড়া। সমুদ্রের বীচ লাল করে বসেছিল। যেই না কোনও শব্দ পেল অমনি ঢুকে যাবে নিজের গর্তে। বালির ভেতরে। দেখুন না একটু দাঁড়িয়ে। খানিক পর আবার ওরা উঠে আসবে—।'

তাই হল। একটু পরেই আবার দেখি লাল হয়ে যাচ্ছে বীচ।

সারা পৃথিবীতে প্রায় ৮০০-৯০০ প্রজাতির কাঁকড়া আছে। অস্ট্রেলিয়ার খাঁড়ি অঞ্চলেই ৬৫০ টি প্রজাতিরও বেশি **কাঁকড়া** আবিষ্কার করা গেছে। সুন্দরবন অঞ্চলেও নানান প্রজাতির অসংখ্য কাঁকড়া দেখা যায়। এর ভেতর ছোট **লাল-কাঁকড়া** ও **সন্ন্যাসী-কাঁকড়াই** বেশি দেখা যায়। এ ছাড়া দেহ কালো ও মাথায় হলদে ফুলের মতো ফুলওয়ালা এক ধরনের ছোট কাঁকড়াও দেখা যায়। গোসাবা,

বাসন্তী, হেড়োভাঙা ও সপ্তমুখী নদীর ধারে। নদীর ধারে জলের পাশে পাশেও ঘুরতে দেখা যায় এক ধরনের ছোট সাদা কাঁকড়া। অশ্বখুরাকৃতি ক্রাঁকড়াও দেখা যায়। এ ছাড়া একটু কালচে লালের উপর কাঁকড়া সুন্দরবনাঞ্চলের নদী নালায় অসংখ্য পাওয়া যায়। এগুলির বিদেশের বাজারেও চাহিদা আকাশচুম্বী। প্রায় প্রতিদিনই এদের ধরা হচ্ছে এ-অঞ্চলের জল-জঙ্গল থেকে।

তবে হ্যাঁ, বিদেশে বাজার আছে বলেই দক্ষিণের এ-সম্পদের ভাঁড়ারকে শূন্য করার অর্থ যে সাক্ষাৎ মৃত্যু— তাতে সন্দেহ নেই। কারণ প্রকৃতি নিজেই এখানে **বন্যপ্রাণী, বনজ** ও **সমুদ্র সম্পদ** নিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখেছে। এখন সে সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া মানে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করা। কিন্তু এ সব নিয়ে আমরা কতটা ভাবছি। কেননা ছোট বড় বিভিন্ন পরস্পর বিচ্ছিন্ন, নদী-নালা ও খাঁড়ি সমৃদ্ধ ব-দ্বীপ অঞ্চলে ভয়ংকর বন্যপ্রাণী, বনজ সম্পদ ও সামুদ্রিক সম্পদ নিয়ে যে সুন্দরবন একদা মানুষকে আশ্রয় দিয়েছিল, সেই মানুষই এখন তার শত্রু। এবং মানুষেরই নির্মম অবহেলায় সে উপেক্ষিত। বসতি ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে যেমন এই বনাঞ্চলের বাইরের দ্বীপগুলিতে মানুষের চাপ বেড়েছে, তেমনই বনাঞ্চলে বনজ সম্পদ ও সমুদ্রে সামুদ্রিক সম্পদের লোভে তারা প্রকৃতির ভাণ্ডার করে তুলছে নিঃশেষিত। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অদূরের কলকাতা নগরীর পরিত্যক্ত বর্জ্য পদার্থ ও শিল্পের নানা রাসায়নিক জঞ্জাল। এসব জঞ্জাল নদী ও সাগরের সঙ্গম পর্যন্ত এসে এখানকার জলকে কলুষিত করতে শুরু করেছে।
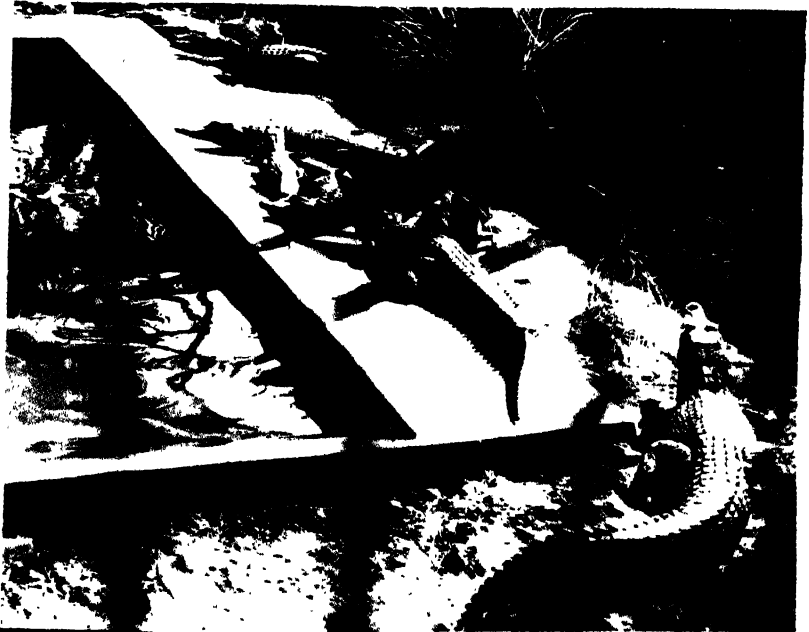
সুন্দরবনের লৌকিক দেবদেবী ও দেবদেবীর মূর্তি

বৈদিকযুগে মানুষের কামনা-বাসনা পরিপূর্ণ করার জন্য দেবদেবীগণ যেমন বিভিন্ন মূর্তির রূপ গ্রহণ করেছিলেন ঠিক তেমনই সুন্দরবনের আরাধ্য দেবদেবীরা আদিম সুন্দরবনবাসীর মনোবাসনা পূর্ণ করাব জন্য বিভিন্ন মূর্তির আকার ধারণ করেছেন। বৈদিক যুগে স্বর্গের দেবতা সূর্য, আকাশের দেবতা বায়ু, পৃথিবীর দেবতা অগ্নিরূপে কল্পনা করা হত। সেই মতো তাঁদের পুজোও হত। কেবলমাত্র তাই নয়, পর্বত, বনস্পতি তীরধনুক ইত্যাদি বিবিধ প্রকরণও দেবতা হিসেবে আলাদা মর্যাদা পেত। অথর্ব বেদের এক দেবতার নাম 'উচ্ছিষ্ট।' ঋক বেদের শেষ পর্যায়ে শ্রদ্ধা, জ্ঞান প্রভৃতি অমূর্ত ধারণাও দেবতারূপে তাঁদের জীবনে স্বীকৃত। তবে এরা হলেন গৌণ দেবতা। এসব ধারণা থেকে পৌরাণিক যুগের দেবদেবীরা প্রবল প্রতাপান্বিত হয়ে উঠেছেন। যেমন বিষ্ণু ছিলেন বৈদিকযুগের অতি গৌণ দেবতা, কিন্তু পৌরাণিক যুগে বিষ্ণুর মহিমা এত বিশাল আকার ধারণ করেছে যে, তাকে নিয়েই রচনা করা হয়েছে এক বিশালাকার পৌরাণিক গ্রন্থ **'বিষ্ণু-পুরাণ'**। বেদে বিষ্ণুর ত্রিপাদ অর্থাৎ সূর্যের উদয়, মধ্যাহ্ন প্রখরতা ও অস্তকে কেন্দ্র করে বলা হয়েছে বিষ্ণু ত্রিলোকের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও লয়কর্তা। এবং শ্রেষ্ঠ দেবতারূপে পৌরাণিক যুগে বিষ্ণুর পুজো ও স্তব করা হয়েছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রমুখের কল্পনা বিশেষ বিশেষ মূর্তির আকারে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের বর্ণনা অনুসারে জানা যায়, ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিদেশ এবং মহেশ্বর তার অঙ্গ থেকে আবির্ভূত হয়েছেন। এইভাবে বিষ্ণুর অঙ্গ-উপাঙ্গ থেকে বহু দেবদেবী, যক্ষ, রক্ষ, মানুষ, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা প্রভৃতি স্থাবর-জঙ্গমের সৃষ্টি হয়েছে। সুন্দরবনের দেবদেবীও এই ভাবধারার স্রোত থেকে বিচ্যুত নয়। তবে বহু পরবর্তীকালে সৃষ্ট হয়েছে বলে সুন্দরবনের দেবদেবী-কল্পনায় হিন্দু-ইসলামীয় প্রভাব দেখা যায়। মুসলমান ও হিন্দুদের যৌথ সংস্কৃতি ও কামনা-বাসনার প্রতীক স্বরূপ বহু দেবদেবী সৃষ্ট হয়েছে। যেমন এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা যায় সুন্দরবনের প্রধান অধিষ্ঠাত্রী দেবী বনবিবির কথা। **'বনবিবি'** এই যৌথ সংস্কৃতি বা কামনা-বাসনার মূর্ত প্রতীক। ইনি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে দেবী হিসেবে পরিচিত ও বিশেষ শ্রদ্ধা নিয়েই এর পুজো হয়।

বনবিবি

বনবিবি প্রকৃতপক্ষে মুসলমানের কল্পনাপ্রসূত এক দেবীমূর্তি। কিন্তু আমাদের জানা আছে মুসলমানরা পৌত্তলিক নয়। সাধারণত তারা কোনও দেবদেবীর পুজা করে না। কিন্তু উক্ত বনবিবি মুসলমানের কাছে সমানভাবে পুজো আদায়

করেন। কিন্তু কেন! আসলে, সুন্দববনের ভয়ঙ্কর নরখাদক সাক্ষাৎ যমসদৃশ রয়েল বেঙ্গল টাইগার বা ব্যাঘ্রকুলের ভয়ে এবং প্রাণে বাঁচার তাগিদে মুসলমানরা বনবিবিকে, পুজা দিতে বাধ্য হয়। দেবীর নাম তাই **'বনবিবি'**। তবে উভয় সম্প্রদায়ের দেবীমূর্তি কল্পনায় কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়। মুসলিম সংস্কৃতিতে এই দেবীর মূর্তি অনেকটা সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের সুন্দরী মহিলার মতো। হিন্দু অঞ্চলে ব্যাঘ্রবাহিনী চণ্ডীর ন্যায়। বহুবিধ মূল্যবান অলঙ্কার ও দামি পোষাক-পরিচ্ছদে সমাবৃতা। 'বিবি' অর্থে ধন বিলাসিনী বুঝায়। এই দেবী যেন মুসলমান সংস্কৃতিতে প্রায় সেরকমই মূর্তির আকারে প্রতিষ্ঠিত। বিবির **'জহুরানামা'** নামে যে পাঁচালি পাওয়া যায় তার থেকে জানা যায় বনবিবি এব্রাহিম নামে

এক ফকিরে কন্যা, এর ভাইয়ের নাম **জঙ্গাল শাহ**। মাতার নাম গুলাল বিবি। ইনি এবং এর ভাই দক্ষিণরায়ের অত্যাচার থেকে বনবাসীদের রক্ষা করার জন্য আল্লার আদেশে সুন্দরবনে আবির্ভূতা হন। বনবিবির জন্মবৃত্তান্ত খুবই আকর্ষণীয়।

বনবিবির জন্মদায়িণী মাতাকে তাঁর পিতা নির্জন বাদাবনে গর্ভাবস্থায় তাব প্রথমা স্ত্রীর প্ররোচনায় বিসর্জন দেয়। গভীর জঙ্গলে অতি অসহায় অবস্থায় এরপর তাঁর মাতা যমজসন্তান প্রসব করে এবং নিঃসহায় হয়ে কন্যাকে ত্যাগ করে শিশুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে চলে যায়। ওই শিশু কন্যাই পরবর্তীকালে **'বনবিবি'** এবং শিশুপুত্র হলেন **জঙ্গাল শাহ**। যাই হোক আল্লার আদেশে এক হরিণী ওই শিশু কন্যা বা বনবিবিকে জঙ্গলে লালন পালন করেন।

এব্রাহিমের প্রথমা বিবির নাম ছিল 'ফুলবিবি'। ফুলবিবির কোনও সন্তান না হওয়ায় বৃদ্ধ বয়সে এব্রাহিম 'গুলাল বিবিকে' বিয়ে করে। দ্বিতীয়া স্ত্রী আল্লার কৃপায় গর্ভবতী হলে 'ফুলবিবি' তার প্রতি বিরূপ হয় এবং এব্রাহিমকে প্ররোচিত করে গুলালবিবিকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে।

এই দুশমন ফুলবিবির জন্য "বনবিবি"—মাতা কর্তৃক জঙ্গলে পরিত্যক্ত হয় ও সাত বছর কাল সময় ধরে হরিণের কোলে প্রতিপালিত হয়। ক্রমে সাত বছরও গেল কেটে।

"বনের হরিণ যত খোদার ফরমানে।
বনবিবিকে পারওয়ারেশ করে সেই বনে।।"

গুলালবিবি শা জঙ্গালিকে নিয়ে বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে বনবিবির সঙ্গে আল্লার কৃপায় একসঙ্গে মিলিত হয়।

ভাইবোন একসঙ্গে মিলিত হবার পর তাদের ভাটির সুদূরে যাবার জন্য খোদার কাছ থেকে আদেশ আসে।

কিছুদিন পরে এব্রাহিম তার দুষ্কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে বনে গুলালবিবিকে খোঁজ করতে এসে পত্নী ও পুত্রকন্যার দেখা পায় এবং পত্নীকে রাজি করিয়ে ঘরে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু বনবিবি ভাইকে জানায়—মা-বাবার সঙ্গে যাওয়ার দরকার নেই। কেননা—

"আঠার ভাটিতে যেতে হবে আমাদের।
খোদার হুকুম এয়ছা আমাদের পরে।।
আমাদের জহুরা জাহের সেথা হবে।
খবরদার মা বাপের সাথে না যাইবে।।"

বোনের মুখে এ-কথা শুনে শা-জঙ্গালি বোনের কাছে থেকে গেল। আর বিষণ্ণ মনে চোখের জলে পিতামাতা পুত্রকন্যার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে যায়। এবং বনবিবি পিতামাতাকে বিদায় দিয়ে ভাইকে নিয়ে মদিনাতে রওয়ানা হয়। সেখানে গিয়ে কামেল নবীর আওলাদের কাছে মুরিদ হয় এবং

কালাম শিক্ষা করে। তাছাড়া ভাইবোন দু'জনে নবীর রওজায় গিয়ে রোজ দরুদছালাম ভজনা করে। তারপর জেন্নাতল বাকিয়াতে গিয়ে ফাতেমাবিবি রওজা শরিফে পৌঁছায়। সেখানে তাঁর ভজনা করে, এবং তাঁর আশীর্বাদ লাভ করে আঠার ভাটির অধিষ্ঠাত্রী হয়। আরও বর লাভ করে যে, বনে কিংবা রণে কেউ তাকে পরাজিত করতে পারবে না। আর তার উপর খোদার নির্দেশ থাকে, যদি কেউ কখনও বিপদে প'ড়ে তাকে স্মরণ করে তবে তাকে যেন বনবিবি উদ্ধার করে এবং সমস্ত রকম ভাবে বিপদমুক্ত করে।

এভাবে আদেশ পেয়ে বনবিবি ও শা জঙ্গালি মদিনা শহব থেকে নেকালিয়া যায়। তারপর তারা হিন্দুস্থানে এসে গঙ্গানদী পার হয়ে ভাঙড় শাহর কাছে আসে। ভাঙর শাহ্ তাদের সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে পরিচয় জানতে চাইলে বনবিবি পরিচয় দেয় এবং তার কাছে ভাটির দেশের পরিচয় ও ভাটিদেশ দখল করাব কৌশল অবগত হয়।

ভাঙড় শাহ্ তাঁকে জানায়, দক্ষিণ রায় ভাটির অধীশ্বর এবং সে খুবই খল প্রকৃতির। কাজেই তার রাজ্যে ভাটিদেশের আধবাসীদেরও দুর্দশার শেষ নেই। সুতরাং সে যেন ভাটিদেশে অধিকার করে। ভাঙড় শাহ্ তাঁকে সমস্ত রকম সাহায্য করবে। প্রথম এই সব স্থান অধিকার করার পরামর্শ দেয়। পরে চাঁদখালি, রায়মঙ্গল, শিবাদহ দখল করতে বলে। তবে চান্দখালির বিচে চাঁদ যেখানে আছে সেখানে যেতে নিষেধ করে।

জঙ্গল কাঁপিয়ে জঙ্গালি শা-র আজান ডাকে দক্ষিণ রায় চঞ্চল হয়ে উঠে এবং বুঝতে পারে "আসিয়াছে দোছরা সে আর" তখন দক্ষিণ রায় তার চেলাদের আক্রমণকারীদের হাঁটিয়ে দেবার হুকুম জারি করে। 'ভাগাইয়া দেহ তাকে কোথা হতে এসে হাঁকে। নাহি জানে সীমানা আমার।' চেলাগণ হুকুম তামিল করতে গিয়ে বনবিবি আর জঙ্গালি শাহকে দেখে ভয়ে পালিয়ে যায় এবং দক্ষিণ রায়কে খবর দেয়। "এক মর্দ্দ, এক বিবি, কি কব দোছরা ছবি, রূপে বন হয়েছে উজ্জ্বলা। বদনে মিলছে খাক, বন্দ করে দুই আঁখ। তছবি হাতে বলে আল্লা আল্লা।"

এই খবরে দক্ষিণ রায় রাগে জ্বলে উঠে এবং মন্ত্রীকে ডেকে রণসজ্জার আদেশ দেয়। কিন্তু দক্ষিণরায়ের মাতা রায়মণি যুদ্ধের সংবাদে পুত্রকে ডেকে সস্নেহে বলে—

"....বেটা তুমি, লড়াইতে যাব আমি। আওরতের সাথে না লড়িবে। কপালেতে আছে যাহা, অবশ্য হইবে তাহা, হেরে আইলে অক্ষ্যাতি হইবে।। তুমি কথা রাখ মেরা, মনে হাসি হবে তেরা, তুমি থাক আমি যুদ্ধে যাই।।"

বীর পুত্রের পক্ষে নারীর সঙ্গে যুদ্ধ করা অমর্যাদাকর মনে করে মাতা রায়মণি বীরাঙ্গনার বেশে বহু সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যুদ্ধে যাত্রা করল।

বনবিবি রায়মণিকে ভূতপ্রেত সহ কড়া বাজিয়ে যুদ্ধে আসতে দেখে ভাই জঙ্গালিকে সজোরে আজান ডাকার জন্য আদেশ করাল। তখন জঙ্গালি-শা জোরে আজান ছাড়ল। 'আজানের আওয়াজেতে, ভুত না পারে টিকিতে। দেও দানব সকলি ভাগিল। ভেগে যায় লাখে লাখ, মুখে নাহি সরে বাক, রায়মণি পড়ে ভাবনায়।' আর এদিকে বনবিবি "আশা এক হাতে লিয়া, তাতে দেওয়া ফুক দিয়া, ফেকিল আছমান তরফেতে। এছমের জালে ঘুরে। যেমন ঝনঝনা গেরে, ডাকিনী সবার উপরেতে।" এর ফলে যত ডাকিনী যোগিনী এনেছিল রায়মণি "গেল সব লাহজায় মরিয়া।" তবু রায়মণি বিপাকে পড়েও দমল না। বরং নিজেকে আরও রনসজ্জায় সাজিযে তৈরি হল এবং ধনুকে কঠিন কঠিন বাণ প্রয়োগ করতে লাগল।

এইভাবে যুদ্ধ করতে করতে যখন রায়মণির সমস্ত বান নিঃশেষ হয়ে গেল তখন রায়মণি রথ থেকে 'নামিল গোস্বায়।' আর হাতে এক ধারালো ছোরা নিয়ে বাঘিনীর মতো বনবিবির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং বনবিবির বুকে সজোরে ছুরিকাঘাত করল। কিন্তু কী আশ্চর্য, বনবিবির বুকে সেই ছুরি ফুলের মতো ঘুরতে লাগল। তখন ভয়ে "রায়মণি দেখে বলে একি অবতার, না লাগে বিবির গায়ে ছুরির আঘাত, ফুল হইয়া ওড়ে।" তবুও বাঘিনী রায়মণি দমবার নয়। আরও ক্রুদ্ধ হয়ে বনবিবির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আল্লার কৃপায় সে আক্রমণও ব্যর্থ হল। তখন কোনও উপায় না দেখে মরিয়া হয়ে ছুটে এসে বনবিবির কোমর ধরে যুদ্ধ আরম্ভ করল।

"হাতাহাতি করে যেন মস্ত হাতি লড়ে, ভিড়ন হইল যেন পাহাড়ে পাহাড়ে। সারাদিন লড়ে দোহে কেহ না পারিল, বনবিবি দেলে তবে বিপাক জানিল।" এবার বনবিবি আর রায়মণির সঙ্গে পেরে উঠছে না। রায়মণি মনে হয় 'এবার বনবিবিরে ডালিবে মারিয়া।' তখন বনবিবি বরকতের স্মরণ করতে থাকে। বরকত জানতে পেয়ে খোদার হুকুমে এক দোওয়া বনবিবিকে দিল।

"বরকতের দোওয়াতে বনবিবি পাইল যে জোর। পাক দিয়া ধরে রায়মণির কোমর। উঠাইয়া ছের পরে জমিনে ডালিয়া, আল্লা নাম নিয়া বসে ছাতি দাবাইয়া।" আর চুলের মুঠি ধরে ছুরি গলায় বসিয়ে জবাই করতে যায়। আর রায়মণি বনবিবির হাতে মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে সন্ধি করতে বাধ্য হল।

"রায়মণি ডরে পাও ধরিল বিবির।
বলে মাপ করে দেহ আমার তকছির"॥

এই কথা শুনে দয়ার ভাণ্ডার মা জননী বনবিবি রায়মণির বুকের উপর থেকে নেমে নিজের আসন গ্রহণ করল এবং বনবাসী সবাইকে ডাক দিল। তারা সবাই ভাটিশ্বরীর সম্মানার্থে নজরানা নিয়ে উপস্থিত হল। চারিদিকে আনন্দের

সাড়া পড়ে গেল। বনবিবি তখন সকলের সামনে বলল:

"বনবিবি বলে সই শোন বিবরণ।
বাটিয়া আটিয়া ভাটি লইব এখন॥
কদাচ মনে কারো দুক্ষু নাহি দিব।
সমান করিয়া বাদা কাটিয়া লইব॥"

কথামত বনবিবি কারও মনে দুঃখ না দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে আঠারভাটি রাজ্য শাসন করতে থাকেন। এই মহত্ত্বে বনের প্রধানগণ খুবই সন্তুষ্ট হয়ে ভাটেশ্বরী বনবিবির আনুগত্য স্বীকার করে এবং সর্দ্দার বলে মানবে এই অঙ্গীকার করে।

আরও জানা যায় যে বনবিবির দক্ষিণ সীমানা ছিল এড়োজোল, উত্তর সীমানা ছিল হাসনাবাদ।

দক্ষিণ রায়কে কোদাখালি দিয়েছিল। আর নিজে বহুবাদা সৃষ্টি করেছিল। "করিয়া বাদার সৃষ্টি খুশিতে ভূষিত সোম মধু বনে পয়দা হইল বিপরীত।" এইভাবে সারা সুন্দরবনে বা বাদাবনে স্বীয় বাহুবলে ও সিদ্ধিবলে সাম্রাজ্য বিস্তার করে সাম্য ও ন্যায়-নীতির সঙ্গে রাজত্ব করেছিল। এমনকি চরম শত্রু রায়মণির সঙ্গে যুদ্ধের পরে পরম বন্ধুর মতো ব্যবহার করে শত্রুমিত্র সবার মন জয় করেছিল এবং বহু পরিশ্রম করে দুর্গম বাদা বনে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে গ্রাম বসিয়েছিল এবং মোম মধুর সন্ধান বের করেছিল। তাই বনবিবি হিন্দু মুসলমানের কাছে আজ পর্যন্ত দেবতার মতো পুজো পেয়ে আসছে। সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থানে আজও তাই দেখা যায় বনবিবির থান বা পুজার বেদী। আর জেলে, গাছকাটারা মধু আরোহণকারী সবাই ঢোকার আগে বনবিবির পুজা করে তার বরাভয় কামনা করে। বনবিবির এই কাহিনীর সঙ্গে আর একটি কাহিনী যুক্ত হয়ে আছে। যে কাহিনী সুন্দরবনের সর্বত্র আজও প্রচলিত। এবং কেন প্রচলিত সে ব্যাখ্যাও পাওয়া যাবে এ কাহিনীর অভ্যন্তরে।

বরিজহাটিতে ধোনাই-মোনাই নামে দু'ভাই বাস করত। একদা ধোনাই বাদাবনে সাত-ডিঙ্গা নিয়ে মোম মধু এনে ব্যবসা করার জন্য প্রস্তুত হয়।কিন্তু তার ডিঙ্গার জন্য একটি লোকের অভাব পড়ে। তখন "ধোনাই খুঁজিতে লোক, রওয়ানা হইল॥ সেই গ্রামে দুখে নামে এক গরীব ছিল। ধোনা মৌলে তার বাড়ি পৌঁছিল যাইয়া॥ দুখে বলে ডাকে দরওয়াজায় খাড়া হৈয়া॥" কিন্তু দুখে তার মায়ের একমাত্র সন্তান। তার দুখেকে বাদাবনে বাঘের মুখে যেতে দিতে রাজি নয়। "মা বলিতে দুনিয়াতে আর কেহ নাই॥ বাঘের মল্লুকে তোরে কি রূপে পাঠাই।"

তখন ধোনাই দুখের মা-র কাছে প্রতিজ্ঞা করল (দুখেকে) সে নিজের ছেলের মতো দেখবে। নৌকাতেই তাকে রাখবে। বাদায় তাকে উঠতে দেবে না। তাই ধোনাই বলল, "ধোনাই কহিল ভাবি না ভাব অধিক। দুখেকে দেখিব আমি বেটার মাফিক।"

তখন নিরুপায় হয়ে ধোনাইর হাতে ধরে অনেক অনুরোধ করে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছেলের চাপে তাকে যেতে দিতে রাজি হল, তবে যাবার সময়ে দুখের মা বলে-"আপদ বিপদে পড়িলে তোমার মনেতে রাখবে এই কথাটি আমার।। জগৎজননী বনবিবি বনে থাকে।। বিপদে পড়িলে তুমি ডাকিও তাহাকে।। বিপদে পড়িলে তাকে ডাক মা বলিয়া।। দয়ালু মা বনবিবি লিবে উদ্ধারিয়া।।"

মাতার আশীবাদ নিয়ে দুখে ধোনাই-এর সঙ্গে ডিঙ্গায় চলে গেল। ডিঙ্গা রায়মঙ্গল, মাতলা নদী পার হয়ে মধুর খোঁজে গভীর জঙ্গলের মধ্যে খাঁড়িতে গড়খালির বাদাবনে গিয়ে এক বিকেলে নোঙ্গর করল। উদ্দেশ্য রাতটা ওখানেই কাটানো। পরের দিন বাদাবনে গিয়ে বহু খোঁজাখুঁজি করেও একবিন্দু মধুর সন্ধান পেল না ধোনাই। "চাকের ভিতর নাহি মধুর ভাণ্ডার।। লীলা খেলা হবে বুঝি কোন দেবতার।। নজরেতে দেখি সহদের ওর নাই। কাছে গেলে চাক খালি দেখিবারে পাই।।" তাই খুব হতাশ হয়ে ধোনাই রাত্রে ডিঙ্গায় ফিরে বিষণ্ণ মনে শুয়ে পড়ল। শুয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। একসময় স্বপ্নে দক্ষিণ রায় ধোনাইকে দেখা দিয়ে জানাল—

"ধোনাকে দক্ষিণ রায় কহিল তখন।
বাদাবনে মোম মধুর আমার সৃজন।।
দণ্ডবক্ষ দেড় ছিল পিতা সে আমার।
দক্ষিণ রায় নাম আমি তনয় তাহার।।

রায় বলে ওরে ধোনা কি বলিব আর।
নর রক্ত খেতে ওরে বাসনা আমার।।
এক লোক মোরে যদি দিতে পার তুমি।
মোম মধু সাত ডিঙ্গা দিব তোরে আমি।।

এই নির্মম কথা শুনে ধোনাইর মাথায় বিনা মেঘে বজ্রপাত হল। কিন্তু এত অর্থ ব্যয় করে এবং এত দূরে সাত ডিঙ্গা নিয়ে এসে শূন্য হাতে ফিরে যাবে কী করে। নানা রকম ভেবে যখন কিছুই ঠিক করতে পারছে না, তখন দক্ষিণ রায় স্বপ্নে আবার বলল যদি নর রক্তে আমাকে তুষ্ট না কর তবে "তোর নাও সব দিব ডুবাইয়া।। যতলোক আনিয়াছ খাওয়াব কুমীরে।। দেখি বেটা কেমনেতে যাও দেশে ফিরে।।" এই কথা শুনে ধোনাই-এর প্রাণ ওষ্ঠাগত। ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। তখন "দক্ষিণ রায় বলে বেটা খুশি যদি চাহ।। দুখকে আমারে দিয়ে মধু নিয়ে যাহ।।" দুখে! শেষ পর্যন্ত দুখেকে চায় দক্ষিণ রায়। ধোনার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। মনে পড়ল দুখের মায়ের কাছে তার প্রতিজ্ঞা কথা। সে যে বলে এসেছে, দুখেকে ডিঙা থেকে নামতেও দেবে না। অথচ এখন! তাছাড়া দুখের মাকে বলবে কী সে! আচ্ছা, দুখে ছাড়া

যদি কাউকে দেওয়া যায়। ভেবে ধোনাই তখন অন্য কাউকে দিতে চাইল। অন্য কোনও মানুষ! কিন্তু ঠিক তখনই ধোনাই শুনল—

"দুখের উপরে মোর দৃষ্টি রায় বলে।
দুখে ছাড়া নাহি লিব অন্যকে সে দিলে।।
রিয়ের এ বাতে ধোনা হইল পেরে-শান।
দুখেকে দিতেই হবে রাজী হইল নিদান।।"

ততক্ষণে দক্ষিণ রায় সন্তুষ্ট হয়ে কেদোখালিতে দুখেকে দেবার জন্য আদেশ দিয়ে অন্তর্হিত হয়। ধোনাই আর কী করে। দক্ষিণ রায়ের ভয়ে সে দুখের মায়ের কাছে দেওয়া প্রতিজ্ঞার কথা বেমালুম ভুলে গেল। নিজের স্বার্থের জন্য দক্ষিণ রায়ের আদেশ মানতে বাধ্য হল। এবং তারই ফলে বনে গিয়ে এবারে প্রচুর মোম মধু পেয়ে সপ্ত ডিঙা ভর্তি করে মনের আনন্দে ডিঙা খুলে স্বস্থানে গমন করল। কিছু দিন পরে ডিঙা কেদোখালিতে এসে নোঙর করে রাত কাটাল। পরের দিন সকালে ছ'টা ডিঙি আগে খুলে গেল। যে ডিঙিতে দুখে ছিল সে ডিঙি দেরি করতে লাগল কাঠ সংগ্রহের জন্য। ধোনার আদেশে দুখেকে নিয়ে সকলে কাঠ কাটতে গেল। কিন্তু দুখে যেতে চায় না। তার মনে সন্দেহ হল। তাই অনেক কাকুতি মিনতি করল। তার মার কথা ধোনাকে বলল—কিন্তু ধোনা কিছুতেই ধন গর্বে তার কাকতিতে কান দিল না।

"ধোনা বলে পাজি বেটা তসতাত বেটার।
একটা ফরমাস যদি মানিস আমার।।
ভালই চাওত জলদি কাট আন গিয়া।
নাও হইতে কান ধরে দিব নামাইয়া।"

তখন কী আর করা! বাধ্য হয়ে মনের দুঃখে দুখে বনে কাঠ কাটতে যায়। কিন্তু ধোনার ইশারায় দুখেকে ফেলে সবাই ডিঙিতে উঠে ডিঙি নিয়ে চলে আসে। কাঠ নিয়ে ফিরে এসে দুখে দেখে ডিঙি নেই। তখন দুখে ধোনার কু-মতলবের কথা বুঝতে পারে। তার কান্না এসে যায়। দুখে—'চরেতে বসিয়া কান্দে কাতর হইয়া'।

কাঁদছিল দুখে। হঠাৎই এ সময়ে চোখে পড়ল, প্রকাণ্ড একটা বাঘ। "প্রকাণ্ড শরীর আর দু' পা উর্দ্ধে তুলে, হাওয়া ভরে আসে বাঘ, খেতে গাল মেলে"।। তখন দুখের প্রাণ দেহ ছাড়া হবার উপক্রম। এই সময়ে হঠাৎ তার মায়ের কথা মনে হতে থাকে। মা বলেছিল, বিপদে পড়লে বনবিবির নাম স্মরণ করবি। তখন মনে প্রাণে বিপত্তারিণী বনবিবিকে দুখে কাতর ভাবে ডাকতে থাকে।

"বলে মাগো বনবিবি কোথায় আছ ছেড়ে।
এই সময় আইস গো মা দুখে মারা পড়ে।।

এতেক বলিয়া তবে জ্ঞান হারাইল।
ভর কুণ্ডে থাকি বিবি জানিতে পারিল॥

ভক্তের ডাকে মুহূর্তের মধ্যে বনবিবি দুখের কাছে চলে আসে। সঙ্গে জঙ্গালি শাহ। এসে দেখে বনবিবি এক প্রকাণ্ড বাঘ দুখের ঘাড় মটকাতে উদ্যত। তখন জঙ্গলি শাহ বিবির নির্দেশে—"খুব জোরে চড় মারে বাঘের মাথায়॥ নাসাকুল চড় খেয়ে ফাফড় হইল॥ জান লিয়া দক্ষিণা দেও দক্ষিণে চলিল॥" অমন বিরাশি সিক্কা এক চড় খেয়ে রাক্ষসরূপী দক্ষিণা রায় প্রাণ ভয়ে নদনদী পেরিয়ে পালাতে থাকে। কিন্তু শাহ্ জঙ্গালি ছাড়বার পাত্র নয়। সে তার পিছু পিছু তাড়া করতে থাকে। এদিকে বনবিবি দুখেকে তুলে "ধুলা শুদ্ধ কোলে নিল জগতের মাতা, বাছা বাছা বলে ডাকে নাহি কহে কথা॥" তখন তার মুখে জল দিয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে, সেবা যত্ন দিয়ে তার জ্ঞান ফেরায়। একটু সুস্থ হয়ে উঠলে বনবিবি তাকে নিয়ে যথাস্থানে ফিরে যায়। দুখে মনের আনন্দে মায়ের কোলে দিন যাপন করতে থাকে।

"এদিকে ধোনা মৌলে মোম মধু ঘরেতে আনিল॥ তামাম শহরে তার খবর হইল।" আবার এও প্রচার করল ধোনা, যে দুখেকে বাঘে খেয়েছে। কিন্তু দুখের মা দুখে বাঘের পেটে গেছে শুনে ঘন ঘন মূর্চ্ছা যেতে থাকে।

"এইরূপে কান্দে বুড়ি ফেরে বাড়িবাড়ি।
কানে কালা চক্ষু অন্ধ ক্ষীণ হইল নাড়ী।

পাগলের মতো, না-স্নান, না-খাওয়া, মাঠেঘাটে দুখের মা ঘুরে বেড়ায় আর জগতজননী বনবিবির স্মরণ করে। 'অন্তর যামিনী মাতা, জানিতে পারিল এবং দুখের মাতার দুঃখে দুঃখিত হইল।' বনবিবি দুখের মা-র শোচনীয় দুঃখের কথা জানতে পেরে দুখেকে তার মায়ের কাছে পাঠাবার কথা ভাবল।

"বিবি বলে যাহ বাবা ঘরে আপনার।
বুড়ি মাতা কান্দে তোর হয়ে জারে জার॥"

কিন্তু দুখে কিছুতেই বনবিবিকে ছেড়ে আসতে চায় না। তখন "বনবিবি বলে বেটা কোরনা ভাবনা॥ আমি তোর পিঠ পরে আছি পোস্ত পানা॥ যখন ধিয়ান তুমি করিবে আমায় মুহূর্তে যাইয়া দেখা দিবই তোমায়॥" দুখের ওজর আপত্তি আর টিকল না। বনবিবির ব্যবস্থা মতো সেকো নামে এক কুমিরের পিঠে চড়ে দুখে তার নিজের গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছুল। "পৌঁছিল যখন গিয়া ঘরে আপনার। দেখে বুড়ি পড়ে আছে হইয়া লাচার॥ চক্ষে নাহি দেখে, কানে না-পায় শুনিতে দেখে দুখে দর্দ্দ দেলে লাগিল কান্দিতে॥" মনের দুঃখে তখন বনবিবির স্মরণাপন্ন হল দুখে। দুখের স্মরণ মাত্র দয়াময়ী বনবিবি 'ল্যাহজায়" দুখের কাছে এসে দেখা দিল। এবং তার মাকে মুহূর্তের মধ্যে দৈব প্রভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ করে দিয়ে অন্তর্ধান হল। বুড়ির জ্ঞান ফিরতে বুড়ি ছেলে ফিরে

পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। আর দুখের কাছে বনবিবির অপার করুণার কথা শুনে "বুড়ি বলে বাচাইল তোরে পাক জাত।। বোনবিবির নামে ক্ষীর করহ খয়রাত।।" তখন বুড়ির কথামত সাত গ্রামে গলায় কুড়ালি বেধে ভিক্ষা করল, আর সাত গ্রামে ভিক্ষে করে দুখে যা পেল—'চাল চিনি দুধ এনে ক্ষীর বানাইল।' এবং বনবিবির থান তৈরি করে পুজো দিয়ে গ্রামের লোককে প্রসাদ বিতরণ করল। সেইদিন থেকে বনবিবির পুজো ও ক্ষীব ভোগ দেওয়া প্রথা শুরু হয়।

এদিকে দক্ষিণ রায় ছুটতে ছুটতে ভাঙড়ে গাজি পীরের কাছে গিয়ে বিপদের কথা জানাল গাজিপীর সব শুনে-

"গাজী বলে দক্ষিণা তুমি না জান সন্ধান।
বনবিবি নাব তার ভাটির প্রধান।।
না বুঝিয়া ফাছাদ করিলে তার সাথে।
তোমাকে হয়রান করিবে হর রাতে।।"

এরকম কথাবার্তা যখন হচ্ছে ঠিক সেই সময়—'সোটা হাতে লিয়া তথা শাহ জঙ্গালি পৌঁছিল।' তখন দক্ষিণ রায় গাজিপীরের পেছনে লুকিয়ে পড়ে এবং উভয়ে 'ছালাম আলেক' হয়। দক্ষিণ রাযকে তার কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা করতে অনুরোধ করে। কিন্তু জঙ্গালী শাহ কিছুতেই রাজি নয়। তাই বলে—"মানুষ ধরিয়া খায় কাফের গাঙার, দেখাইয়া দিব মজা দেখিব এবার।। গাজিপীরের অনুরোধে সবাই মিলে বনবিবির কাছে মাপ চাইবার জন্য গেল।

"গাজী আর রায় গেল সাথে শা জঙ্গলীর।
যাইয়া হাজির হইল হুজুরে বিবির।।

বনবিবি তিরষ্কার করল। কারণ দরবেশ হয়ে এসে নররক্ত খাওয়া অমার্জনীয় অপরাধ। কিন্তু গাজি নাছোড়বান্দা। বনবিবির পায়ে ধরে মিনতি করল। "মিনতি করাতে ছেলে রহম হইল। দক্ষিণ রায়ের গোনা মাফ করে দিল।" তবে দুখের দুঃখ লাঘবের জন্য গাজি পীর ও দক্ষিণ রায়কে সমস্তরকম সাহায্য করার আদেশ দিল।

"কহে বিবি এক বেটা দুখে ছিল মোর।
তার দুখেতে আমি আছিনু কাতর।।

তখন গাজি প্রতিশ্রুতি দিল "সাতজালা ধন আমি দিই দুখেরে। কারার করিনু আমি তোমার হুজুরে।।"

বনবিবি জিজ্ঞেস করল, কিন্তু দুখে এই সব ধন কি করে পাবে? গাজি বলে "পাবে দুখে ঘরেতে বসিয়া।" এই শুনে বিবির খুব আনন্দ হল। এবং দুখেকে স্বপ্নে জানাল, দক্ষিণ রায় ও গাজি পীরকে স্মরণ করলেই তারা দুখের দুঃখ লাঘবের জন্য সাহায্য করবে। দুখে তখন বনবিবির স্বপ্নাদেশ মতো গাজিকে

স্মরণ করা মাত্র সাত জালা মোহর তার বাড়ির তাল গাছের নিচে পেল। তারপর দক্ষিণ রায়কে স্মরণ করে "মাল মসলা কাষ্ঠ আদি" সব কিছু পেল এবং তাই দিয়ে বিরাট ইমারত তৈরি করে এবং ধোনায়ের বাড়িতে বিয়ে করে পরম সুখে দয়ার সঙ্গে প্রজা পালন করতে লাগল। ক্রমে দুখের সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

"দুখের রাজত্বে প্রজা থাকে আরামেতে।
বিনা খাজনায় বাস করে গরীবেতে।।
তাবেদার রইল ঘাতক জমিদার।
ফাজেল মৌলবী করেন বিচার।।

এই দুখে তখন বিরাট ভাটির মালিক হয়ে 'বোনবিবির নামে খুব দান খয়রাত করিল।' এইভাবে আঠারভাটিতে বনবিবির পুজো ও ক্ষীর ভোগ দেওয়ার প্রবর্তন হল। সম্ভবত, এই দুখেই বনবিবি পুজার প্রবর্তক।

দক্ষিণ রায়

বনবিবির পরে লৌকিক দেবতা দক্ষিণ রায় রূপে যে দেবতা অতি গুরুত্বপূর্ণ তিনি দক্ষিণ রায়। দক্ষিণ রায় সম্বন্ধে বহুরকম মতবাদ রয়েছে। বনবিবিকে যেমন কেউ কেউ বলেন হিন্দুর দেবতা, কেউ কেউ বলেন আদি পাঠান মুসলমান সাধিকা বা ইসলাম ধর্ম প্রচারিকা। সেরকম দক্ষিণ রায়কে কেউ কেউ বলেন ইনি প্রতাপাদিত্যের বংশধর। কেউ কেউ বলেন, আদিম অরণ্যবাসীরা কল্পিত দেবতা। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলেন মৌর্যযুগের সমসাময়িক এই দক্ষিণ রায়ের আবির্ভাব। এবং বাংলাদেশের দক্ষিণাংশের শাসকদের দক্ষিণ রায় বলা হত। প্রশ্ন আসছে তবে কি উত্তরাংশের শাসকদের উত্তর রায় বলা হত? মনে হয় দক্ষিণ রায় প্রতাপাদিত্যের সেনানায়ক মদন রায়েরই বংশধর। কারণ মদন রায়ই সুন্দরবনের প্রথম রাজা উপাধি পান। আগেই বলেছি দক্ষিণ রায় দণ্ড রক্ষের পুত্র। তার মায়ের নাম রায়মণি। বাবা খুব প্রতাপশালী ব্যক্তি। মা ছিল তান্ত্রিক সাধিকা ও যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণা। মল্লযুদ্ধেও খুব পারদর্শিনী। দণ্ড রক্ষের মৃত্যর পর দক্ষিণ রায় এই দক্ষিণ সুন্দরবনের অধীশ্বর হয়। ছেলের উপর তার মা-র প্রভাব ছিল খুবই প্রবল। মায়ের প্রভাবে দক্ষিণ রায় তান্ত্রিক হয়ে ওঠে। দক্ষিণ রায় ছিল অতি সুপুরুষ। ইনি কার্তিকের মতো সুদর্শন স্বর্ণ কান্তি, ও বলবান পুরুষ। ইনি মোম মধু প্রভৃতি বনজ সম্পদের অধিকারী ছিলেন এবং বাঘ-কুমির প্রভৃতি হিংস্রজন্তু তার বশীভূত ছিল। তাই দক্ষিণ রায়কে বাঘের দেবতা হিসেবে পুজো করা হয়। দক্ষিণ রায়কে পুজো করলে বাঘের হাত থেকে বনে রক্ষা পাওয়া যায় বলে কাঠুরে ও জেলেদের ধারণা। নির্বিঘ্নে কাঠ ও মধু সংগ্রহ করতে হলে ও পর্যাপ্ত পরিমাণ এই সমস্ত বনজ সম্পদ পেতে হলে দক্ষিণ রায়কে তুষ্ট রাখা প্রয়োজন। তাই সাড়ম্বরে তার পুজোর অয়োজন!

কাজেই দেখা যাচ্ছে, সুন্দরবনের এই তিন লৌকিক দেবদেবীই একসঙ্গে পুজো পান! এই পুজো বহুকাল ধরে হয়ে আসছে। পুজো সাধারণত করে গাছকাটার দল ও মধু সংগ্রহকারীরা এবং জঙ্গলে যাওয়ার আগে এই সব দেব দেবীকে তুষ্ট রাখার জন্য। কিন্তু কী ভাবে পুজো হয় বনবিবি বা দক্ষিণ রায়ের!

তিনটে বড় বড় ঘট, ঘুনসি, লাল কারের সুতো, কাঠি, চিরতা, লাটিম, লাল রঙের কাঠের কৌটো, শোলার টোপর ও ঝোড়া — এসবই হল 'বন সজ্জা'। বনবিবির পুজোর উপাচার। এই পুজোয় কোনও ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের প্রয়োজন. হয় না। আগেই বলা হয়েছে এই পুজো হিন্দু-মুসলমান সকলের। শুধু 'বনসজ্জা' সাজিয়ে ভক্তিভরে পুঁথি পড়লেই হল। পুঁথি কলকাতার বটতলার প্রকাশকের কাছে পাওয়া যায়। বইয়ের নাম 'আদি ও আসল বনবিবির জহুরানামা নারায়ণী জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা'। রচয়িতার নাম মোহম্মদ মুনশি।

যাই হোক, এই তিন লৌকিক দেবদেবীর পাশাপাশি, এদের কেন্দ্র করেই সুন্দরবনের আবাদে এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। যারা প্রধানত জঙ্গলের কাঠুরে, মোম-মধু সংগ্রহকারীদের সফরসঙ্গী হিসাবে জঙ্গলে যায়। এদের বলা হয় 'গুনিন' বা 'বাউলে'। এই বাউলে সম্প্রদায় কেবল উক্ত দলের সঙ্গী তা নয়; প্রধানত এরাই উক্ত দলের পথ-প্রদর্শক। অর্থাৎ বাদা অঞ্চলের বিশ্বাস, জঙ্গলে ঢোকার আগে বনবিবির স্মরণ করে না ঢুকলে বিপদ অনিবার্য। হয় বাঘের মুখোমুখি হবে, বাঘে তুলে নিয়ে যাবে; অথবা সাপ, কুমির, কামট কিংবা মাছির আক্রমণে মৃত্যু হবে। তাছাড়া মধুও পাওয়া যাবে না। তাই শতকরা ১০০ ভাগ লোকই এই বিশ্বাস থেকে এই 'গুনিন কিংবা 'বাউলে'-দের সঙ্গে নেয়।

'গুনিন' বা 'বাউলে'-র কাজ

নৌকা বা ডিঙি নিয়ে কাঠ বা মধু আনার দলে একজন ম্যানেজার থাকে। এই ম্যানেজারকে এ-অঞ্চলে বলা হয় 'সাজান'। সাজানের কাজ বনদপ্তরের অফিস থেকে পারমিট আনা, টাকা-পয়সা দিয়ে লোক-লস্কর, নৌকা ও গুনিন ঠিক করা। টাকা পয়সা সাজান পান তার মহাজনের বা মালিকের কাছ থেকে। যারা এ-কাজে বা এ-ব্যবসায় টাকা লগ্নী করেন। তারাই সাজানকে টাকা দাদন দেন।

. তা গুনিনকে পছন্দ করে 'সাজন' এবং গুনিনের সঙ্গে তখনই তার চুক্তি হয়। চুক্তি কী রকম? না চুক্তি হল, এক কালীন। আগের অধ্যায়ে বলা হয়েছে মধু আনার সময়কে বলা হয় 'মহল'। তা মহলে গেলে গুনিন পাবে ১০০০ টাকা। মাছ ধরার দলে থাকলে পাবে ৫০০ টাকা এবং কাঠ কাটার দলের সঙ্গে গেলে ৭০০ টাকা। এই মজুরি ফি হল সরকারি পারমিট নিয়ে যারা মধু, মাছ বা কাঠ আনতে যায় সেই দলের ফি। কিন্তু পারমিট না নিয়ে অর্থাৎ চুরি করে যারা মধু , মাছ, বা কাঠ আনতে যায়— তাদের দলে আবার গুনিন বা বাউলের ফি বাড়ন্ত। অর্থাৎ 'মহলে' গিয়ে একই গুনিন দু'তিনটি

নৌকার 'খেপ' মারে। এ ক্ষেত্রে নৌকাপিছু ১০০০ টাকা । এর উপর মধুর এক ভাগ মাছ বা কাঠের ক্ষেত্রে ৭০০/৮০০ টাকা। তাঁর মানে এক একটি 'মহল'এর হিসেবে যা দাঁড়াচ্ছে, পারমিট ছাড়া জঙ্গলে গিয়ে একজন গুনিন তিন তিনটে খেপ মারলে একসঙ্গে ৩০০০ টাকা নিয়ে ফিরবে ও সেই সঙ্গে মধুর 'তিনভাগ'। কিন্তু পারমিট নিয়ে গেলে সে দল থেকে পাবে মাত্র ১০০০ টাকা। তা মহলে গেলে টাকা বেশি, তারপর কাঠ কাটতে গেলে এবং সবশেষে মাছ মারতে গেলে। কিন্তু কেন এই তফাৎ!

তফাৎ এই জন্য যে 'মহল'-এ গেলে বিপদ বেশি। তারপরে কাঠ কাটতে গেলে। তার মাছ। কিন্তু গুণিন কী করে দলের সঙ্গে গিয়ে!

ধরা যাক, মহলে চলেছে কোনও নৌকা, যে জঙ্গলে যাবে, নদীর ধারে সেই জঙ্গলের সামনে এসে ধীরে ধীরে দাঁড়াবে নৌকা। নৌকা দাঁড়াতেই প্রথমে নামবে গুনিন। সকাল থেকেই সে রয়েছে উপোসি। পড়েছে নতুন ধুতি। সারাদিন থাকতে হবে তাকে 'শুদ্ধ' বা 'পবিত্র' মনে। সে জল খেতে পারবে না। নিজের থুথু পর্যন্ত গিলতে পারবে না।

তা, প্রথমে নেমে সে একটি শিশু গাছ [চারা গাছ অর্থে] বেছে তার সামনে বসবে। যে গাছের পাতা ছেঁড়া হয়নি বা ডাল কেউ ভাঙেনি, এখনও সম্পূর্ণ শিশু চারা। সে গাছের সামনে বসে গুনিন তার দু'হাতের তালু রাখবে মাটিতে। তারপর তার শুরু হবে 'বনবিবি' বন্দনা। বলবে বিড়বিড় করে এক মনে। 'বনবিবি মাইবিবি দুলবিবি॥ ফতেমা বিবি ফুলবিবি॥ আমার 'মাল'* ছাড়া যদি যাও॥ অন্য ঠাঁই।

অথবা বলবে

পুবে হামজার বন্ধ
দক্ষিনে কোলেফ আল্লার বন্ধ
পশ্চিমে সোলেমান পয়গম্বরের বন্ধ
উত্তরে ভানু এসকরের বন্ধ

বাস, জঙ্গল বেঁধে দেওয়া হল এবং বনবিবিকেও স্মরণ করা হল। এবার বনবিবির উদ্দেশে মুরগি উৎসর্গ করে জঙ্গলে ছেড়ে দিতেই দল ঢুকবে জঙ্গলে। কিন্তু গুনিন নড়বে না। ডাঙায় গুনিন সমসময় মাটি ছুঁয়ে থাকবে। দলের সবাই কাজ শেষ করে নৌকায় ফিরে এলে গুনিন তখনই ডাঙা ছেড়ে উঠে আসবে নৌকায়। নৌকায় উঠার আগে আবার মন্ত্র পড়ে সে 'লগি পোতা' করে নেবে। 'লগি পোতা' মানে নৌকার চারদিকে গণ্ডি কেটে দেওয়া। যাতে রাতে সে নৌকায় বাঘ বা কুমির আক্রমণ না করতে পারে। সারাদিন উপোসের পর রাতে গুনিন খাবে সেদ্ধ ভাত। আর ফল।

* 'মাল' জঙ্গলের মধু সংগ্রহ করার জায়গা বা জঙ্গলে 'কাঠ' যতটা জায়গা জুড়ে কাটা হবে সে জায়গা অথবা নদীর জলে যতটা জায়গা জুড়ে মাছ ধরা হবে সে জায়গা।

একজন গুনিন বৃদ্ধ হলে সে দীক্ষা দেয় আবার নতুন গুনিনকে। নতুন হবু গুনিন তখন দক্ষিণা দেয় গুরুদেবকে। এই দক্ষিণা হলে ৫ টাকা। সঙ্গে গুরুর জন্য নতুন একটি ধুতি ও গুরু মায়ের জন্য শাড়ি; এ ছাড়া চাল, জল, সবজি ইত্যাদি।

বাদা অঞ্চলের জনশ্রুতি বা প্রবাদ

[ক] সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলে জনশ্রুতি ছড়িয়ে আছে যে কাউকে একবার বাঘ খেয়ে নিলে সে 'বাঘাভূত' হয়ে জন্মগ্রহণ করে। তার প্রেতাত্মা জঙ্গলে বাঘের রূপ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আর মানুষের অপেক্ষায় থাকে। যদি কোনও মানুষের দেখা পায় তো সেই মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এবং তাকে মারতে পারলেই তার 'ভূত জন্ম' থেকে মুক্তি হয়। তাই জঙ্গলে মানুষ মধু বা কাঠ আনতে ঢুকলে সেই প্রেতাত্মা মানুষেরই সুরে অবিকল ডাকতে থাকে। এ জন্য জঙ্গলে কেউ কারুর নাম ধরে ডাকে না। ডাকে 'কু' দিয়ে। একজন ডাকবে 'কু' এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যজন উত্তর দেবে 'কু'।

[খ] সুন্দর বনের আবাদ এলাকায় নারকেল গাছ্ নেই বললেই চলে। কেননা স্থানীয় লোকেদের বিশ্বাস, নারকেল গাছ পুঁতলে নাকি নির্বংশ হতে হয়।

[গ] ঝড় তুফানের মধ্যে বিপদ সংকুল নদীপথে মাঝিরা যখন নৌকা চালিয়ে যায়, তখন শক্তিধর গাজিদের গুণকীর্তন করলে নাকি কোনও বিপদ ঘটে না। মাঝিরা তাই স্মরণ করে—

"আমরা আছি পোলাপান।
গাজি আছেন নিখাবান
শিরে গঙ্গা দরিয়া।
পাঁচ পীর বদর বদর॥

[ঘ] জেলেরা মাছ ধরতে যাওয়ার আগে জেলে পরিবারের বিশ্বাস, সত্যনারায়নের পুজো দিলে যাত্রা শুভ হয়। জেলে-বউরা তাই পুরুষরা 'গোণে' বেরোবার আগে সত্যনারায়ণ পুজো দেয় ঘরে ঘরে।

[ঙ] ডিঙি নৌকা নিয়ে যাত্রা শুরুর আগে বাদা অঞ্চলের মানুষরা 'নৌকা বুড়ি'-র পুজো করে। এদের বিশ্বাস, নৌকা বুড়িকে স্মরণ করে বেরোলে নৌকোয় কোনও বিপদ ঘটবে না। এ বিশ্বাস নদী-নালা অধ্যুষিত সুন্দরবন অঞ্চলের লঞ্চের সারেঙ দের মধ্যেও দেখা যায়। তাই যে কোনও দিন যাত্রার শুরুর আগে ভোর বেলা তারা লঞ্চের সামনের দিক দরিয়ার জল দিয়ে ধুয়ে তাতে এক গুচ্ছ ধুপকাঠি জ্বালিয়ে জল দেবীর বন্দনা করে।

সুন্দরবনের দেব দেবীর মূর্তি

নিম্নবঙ্গের গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ সুন্দরবন অঞ্চলে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, প্রভৃতি ধর্ম সাধনার পাশাপাশি বৃক্ষপুজো, প্রতীক পুজো, হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মিশ্রণ রূপে পীর ও বিবি-পুজোর সন্ধান পাওয়া যায়। এই সব দেব দেবীর যে সব অবয়ব মূর্তি আকারে পাওয়া যায় সেগুলি হল:

ক) দক্ষিণ রায়: এব পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর আকৃতির বর্ণনা দেওয়া হয়নি। মূর্তির অবয়বে দক্ষিণ রায় যেভাবে দক্ষিণ বঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছেন তা হল— বাঘ বা ঘোড়ার পিঠে উপবিষ্ট তিনি, অথবা কখনও জানু পেতে বসে। এঁর গায়ের রঙ হলুদ। দেহের গড়ন বলিষ্ঠ। বড় গোঁফ। হাতে যুদ্ধাস্ত্র। কার্তিক ঠাকুরের মতো সুপুরুষ চেহারা।

পৌষ সংক্রান্তি বা মাঘ মাসের প্রথমে দক্ষিণবঙ্গের এই লৌকিক ঠাকুরের প্রতীক রূপে একটি 'বারা' ঘট ও এঁর মা রায়মণির প্রতীক হিসেবে আরও একটি 'বারা' ঘটের পুজো হয়। এই জোড়া ঘটকে 'বারা' মুণ্ডুও বলা হয়। নিম্নবঙ্গের বহু জায়গায় পৌষ মাসে কুমোরদের ঘরে ঘরে দক্ষিণ রায়ের মূর্তি বা 'বারা' ঘট তৈরি হয়।

'বারা' ঘটের আকৃতি হল অনেকটা উল্টো ঘটের মতো। ঘট উল্টে তার মাথায় চুড়ো ও বৃক্ষপত্র লাগিয়ে তাতে মুখ এঁকে দেয়া হয়।

(খ) বনবিবি: মাথায় চুড়ো, কপাল পর্যন্ত নেমে আসা চুল, অনেকটা লক্ষ্মী-সরস্বতীর মতো প্রসন্ন মুখ, গৌরবর্ণা, হাতের করতলে অভয় বাণী। পরনে লাল শাড়ি। এঁর বাহন বাঘ।

(গ) শা জঙ্গলি বা জঙ্গলি শাহ: পরিচয়ে ইনি বনবিবির ভাই। শা জঙ্গলির উপবিষ্ট মূর্তি দেখা যায়। এঁর গায়ের রঙ সবুজ, বুকের ওপর লাল চাদর, গোলাকৃতি মুখ ও কান ঢাকা। মাথার চুলের রঙ চকচকে কালো ও সিঁথি কাটা। হঠাৎ দেখলে মনে হবে 'আলি বাবা ও চল্লিশ চোর' গল্পের বর্ণিত সেই দস্যু সর্দার।

(ঘ) পঞ্চানন্দ: পঞ্চানন্দর মূর্তির গায়ের রঙ লাল। স্থূল চেহারা। বেশ ভুঁড়ি আছে। পঞ্চানন্দ ঠাকুরকে এই অঞ্চলে শিবরূপে ভাবা হয়।

(ঙ) আটেশ্বর: মল্লবীরের মতো চেহারা। গায়ের রঙ আকাশি। মাথায় পাগড়ি, ডান হাতে কাঁটা মুগুর, কানে মাকড়ি, হাতে বালা, প্রকাণ্ড বড় গোঁফ। দেখলে বেশ ভয় লাগে। এ অঞ্চলে কেউ কেউ বিশ্বাস করে আটেশ্বরের পুজো করলে অশুভ শক্তি দূর হয়। কেউ কেউ মনে করে, আটেশ্বরও শিবেরই অংশ। আবাব কারও মতে, বনের অধীশ্বর।

(চ) পেঁচো-খেঁচো: পুরুষ বেশে ছোট ছোট দুটি মূর্তি। চোখের কোল রক্তবর্ণ। মুখের ভেতরটাও লাল। গায়ের রঙ কালো। শীর্ণ চেহারা। বুকে শাদা রঙের

আঁচড়। মাথায় দু'জনেরই কালো রঙের ছোট উঁচু উঁচু টিবি। পেঁচোর পরনে বাঘের ছাল; খেঁচোর পরনে মাল কোঁচা দেওয়া ছোট কাপড়।

(ছ) ষষ্ঠী: কালো বেড়াল হল বাহন। তার উপরে বসা মূর্তি। পরনে লাল টুকটুকে শাড়ি। দু' পাশে দুটি সন্তান।

(জ) শেতলা: প্রচলিত শেতলার মূর্তি।

(ঝ) ভিন্ন নামের ভিন্ন ভিন্ন বিবি: এ-সব অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় বিবির থান। বনবিবি যেমন তেমনই ওলাওঠা বা কলেরা রোগের দেবী **ওলা বিবি**। বসন্ত রোগ বা পক্স-এর দেবী **ঝোলা দেবী,** সান্নি পাতিক জ্বর ও মস্তিষ্ক বিকারের দেবী **মড়ি বিবি,** বিপত্তারিনী দেবী **আসান বিবি,** ঝড়-বৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী দেবী **বহেড়া বিবি, বাত্তড়ি বিবি** বা **বিশালাক্ষী দেবী**।

ভিন্ন ভিন্ন নামের বিবি মা-র মূর্তি ছাড়াও সুন্দরবন অঞ্চলে মনসা, বড় খাঁ গাজি, মানিক পীর, বসন্ত রায়, হাড়ি ঝি, কুমিরের পিঠে বসা কালু রায়, সিংহের পিঠে রায়মণি প্রভৃতির মূর্তি দেখা যায়।

৫

সুন্দরবনের মানুষ ও তাদের পেশা □ জাতপাত ও ভাষা।

কেউ এসেছিল মেদিনীপুরের কাঁথি বা তমলুক থেকে। কেউ এসেছিল বিহার থেকে, জমি থেকে উৎখাত হয়ে যাওয়া বা ভূমিহীন কৃষক, এদেরই একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা; কেউ এসেছিল আবার খুলনা বা যশোর থেকে, গাঙ-জঙ্গল পেরিয়ে। এসেছিল এরা দলে দলে, জমির লোভে—এ-অঞ্চলে নতুন ইজারা দেওয়া সমস্ত লাট অঞ্চলের দিকে। এ-সমস্ত ইজারার বড় একটা শর্ত থাকত। সেই শর্ত হল, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জঙ্গল-হাসিল করে জমি চাষযোগ্য করে তুলতে হবে। ফলে লাটদার আর তাঁদের নায়েব, গোমস্তার দল, চকদার ও পরবর্তীকালে অবস্থাপন্ন রায়তদের একটা অংশ ভূমির চাহিদার সুযোগ নিয়ে এসব নবাগতদের লোভ দেখাত। জানাত, জঙ্গল হাসিল করলে তাদের জমির স্বত্ব দেওয়া হবে। জঙ্গল হাসিল হত —বাঘ-কুমির আর নোনা জলের প্লাবনের সঙ্গে অসুখ বিসুখ ও ঘোর-জঙ্গলের নানা বিপদ নিয়ে, প্রাণপন লড়াই করে প্রকৃতির বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে জমিতে সোনা ফলালেও এরা হত আবার উৎখাত। উৎখাত হয়ে আবার তারা চলে যেত নতুন এলাকায়, জঙ্গল হাসিলের কাজে। সেখানেও ঘটত একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। কিন্তু এল যারা তারা কেউই আর ফিরতে পারল না। রোগে ভোগে, অসুস্থ হয়ে বিনা চিকিৎসায় অনেকে গেল মরে, কেউ গেল বাঘের পেটে বা কুমিরের উদরে, কেউ সাপের কামড়ে, মাছি বা বিষাক্ত পোকামাকড়ের আক্রমণে ও প্রাকৃতিক ঝড়-ঝঞ্ঝায়। আর এত সবের পরেও যারা রইল বেঁচে, তারাই হয়ে রইল সুন্দরবনের প্রকৃত অধিবাসী ও ভাগচাষী। এরপরে ঊনবিংশ শতাব্দী পার হয়ে ১৯৪৭ সালে দেশ-ভাগের পর চিত্রটা গেল আরও বদলে। সুন্দরবনের এক অংশ বিভক্ত ভারতের পূর্ব পাকিস্তানে [বর্তমান বাংলাদেশ] পড়ায় ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের এক অংশ চলে এল যশোর ও খুলনা থেকে। এরা এসে বসতি নিল সুন্দরবনের পূর্ব-প্রান্তে। আর দক্ষিণে রইল যারা তাদের আসার উৎস মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চল সে কথা ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে।

এরা কেউ কেউ সপরিবারে এসেছিল, জমি বিলি বন্দোবস্ত নিয়ে চাষাবাদ করার অভিপ্রায়ে। পৈতৃক জমিজমা বা বাস্তুভিটা দেনার দায়ে বিক্রি করে দিয়ে দেনা মিটিয়েছে এবং জমি পাবার আশায় জন্মভূমির মায়া কাটিয়ে চকদার বা লাটদারদের আড়কাঠির খপ্পরে পড়ে বাদা অঞ্চলে একদিন এসে পা দিয়েছে।

আর কিছু লোক এসেছে লাটদার বা চকদার কর্মী হিসাবে। এখানকার সুযোগ সুবিধা দেখে পরে তাদের পরিবারের লোকজনদের নিয়ে এসেছে। এরা কিন্তু কোনও জমি বিলি ব্যবস্থা নেয়নি। এরা লাটদার বা চকদারের দেওয়া জায়গায় কোরফা হিসাবে ঘর বেঁধেছে এবং তাদের দেওয়া জমি ভাগে চাষবাস করেছে আর ফসল উঠলে জমির মালিকের দেনা মিটিয়েছে। যদি কিছু উদ্বৃত্ত হয়েছে তা বাড়ি নিয়ে গেছে। নতুবা রিক্ত হস্তে ঘরে ফিরেছে। আবার ধার হিসেবে ধান ও টাকা নিয়ে সংসার খরচ চালিয়েছে। এরকম লোকের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৪০% বা তার কিছু বেশিই হবে। জমিদাররা নিজের স্বার্থে অনাবাদী জঙ্গলকে পরিষ্কার করে চাষাবাদ করার লক্ষ্যে এরকম সহায় সম্বলহীন পরিবারগুলিকে কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়ে রাখত। কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল যে এদের এখানে স্থায়ী করতে না পারলে তাদের জমির কোনও উন্নতি হবে না এবং লাভ তো দূরের কথা বরং তাতে ক্ষতিই হবে। তাই তারা এদের এভাবে নিঃস্ব এবং জমিদারদের উপর নির্ভরশীল করে রাখত। আরও একটি কারণ আছে, যাতে এই সব হৃত দরিদ্র লোকগুলি স্বাবলম্বী হয়ে অন্য কোথায়ও চলে না যায়। এই লোক-সংখ্যার বেশি ভাগই এসেছিল নিম্নবর্ণের হিন্দু শ্রেণী থেকে যেমন ধোপা, নাপিত, হাড়ি, মুচি, মেথর, নমঃশূদ্র, বা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় অর্থাৎ এখন যাদের মধ্যে অনেককে তপশীল শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। কারণ বিত্তশালী জমিদার বা তাদের কর্মচারীদের সভ্য জীবনযাপনে এইসব লোকের ভূমিকা ছিল। কেননা তখন এইসব স্থান ছিল যোগাযোগ শূন্য। হাট বাজারহীন দুর্গম জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখানে কিছু দিন বাস করতে গেলে উপরোক্ত শ্রেণীর পেশার লোকের প্রয়োজন ছিল, তাই জমিদার বা চকদারগণ তাদের কাছাড়ি বা জমিদারি বা চকদারি অফিস বা কার্যালয়ের পাশাপাশি এইসব শ্রেণীর লোকদের বিনামূল্যে পাঁচ কাঠা বা দশ কাঠা জমি দিয়ে বসিয়েছিল। তখন অর্থবল ছাড়া লোকবলের প্রয়োজন ছিল বেশি কেননা লোকের মাধ্যমে তখন সব কাজ করতে হত। সুন্দরবনের অধিকাংশ জায়গায় যাওয়ার কোনও বাস বা রেলপথ ছিল না। একমাত্র নৌকাই ছিল যোগাযোগের উপায়। মেদিনীপুর, হাওড়া বা কলকাতা থেকে নৌকাযোগে আসতে সময় লাগত তখন প্রায় দিন দশেক। অনুকূল হাওয়া হলে কম সময়ে যেত, তা না হলে প্রতিকূল হাওয়ায় দাঁড় টেনে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে দীর্ঘদিন লেগে যেত।

আর একশ্রেণীর লোক এখানে স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করেছিল। তারা হল জমিদার বা চকদারের বিভিন্ন কর্মচারী। এদের মধ্যে ছিল নায়েব, গোমস্তা, পেয়াদা ও লস্কর। নায়েব ছিল দ্বিতীয় জমিদার বা চকদার। দ্বিতীয়ই বা বলি কেন, এরাই ছিল আসল মালিক, জমিদারের লাভের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ এরা উপভোগ করত। কারণ জমিদার বা চকদার বা তাদের ভোগবিলাসে

মত্ত পুত্র প্রপৌত্রগণ এই দুর্গম অঞ্চলে খুব কমই আসত। যদিও বা আসত তা ধান তোলার সময়। একেবারে ধান বিক্রি করে টাকা নিয়ে তারা চলে যেত। আর কখনও ধারে কাছে ভিড়ত না। সুতরাং সুন্দরবনে ছিল নায়েব পেয়াদার রাজত্ব। নায়েব ছিল এদের সবার উপরে। এদের নির্দেশেই চাষী এবং মালিক উভয়ই পরিচালিত হত। নায়েবরাই ছিল আসল জমিদার, অধিকার থাকুক না থাকুক— ওরা খুবই প্রতাপশালী ছিল। এরা সাধারণ লোক বা চাষীদের নানা রকম অত্যাচার ও অশালীন ব্যবহার করত। এদের দাপটে সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত থাকত, এদের বিরুদ্ধে কেউ জমিদারের কাছে কিছু নালিশ করতে সাহস করত না। কেউ যদি কখনও অতিষ্ঠ হয়ে নালিশ করত তবে তার সুবিচার তো দূরের কথা জমিদারের অবর্তমানে বা অনুপস্থিতিতে নায়েবরা তাদের অনুচরদের মাধ্যমে নাজেহাল করত এবং এমন সব অমানুষিক অত্যাচারের ব্যবস্থা করত যাতে তারা আর কখনও এ পথে এগুতে সাহস না পায়। ফলে নায়েবের বিরুদ্ধে কেউ কোনওদিন, ক্ষোভ থাকলেও কিছু বলতে পারেনি। একেবারে পর্যুদস্ত হয়ে শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নায়েবদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। জমিদারও তাদের অন্যায় অত্যাচারের বিষয় উপলব্ধি করলেও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বিরুদ্ধে সহজে কোনও ব্যবস্থা নিতে সাহস করত না। কারণ তারা ভালোভাবে জানত যে নায়েবকে চটাতে গেলে তাদের জমিদারি উল্টে যাবে। তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে যে এর ব্যতিক্রম হয়নি তা নয়। এমন হয়ত প্রজাদরদী জমিদার ছিল যারা নায়েবদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক অপসারণ বা স্থানান্তর প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করত। যাই হোক, এই নায়েব নামধারী ব্যক্তিগণ নিঃসঙ্গভাবে বেশিদিন থাকতে পারেনি। তারা জমিদারের কাছ থেকে উপহার হিসেবে বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কিছু জমি নিজের নামে নিয়ে ছিল।
পরিবারবর্গকে নিয়ে এসে সুবিধামত স্থানে বসবাস করতে আরম্ভ করেছিল। পরে বিভিন্ন অসৎ উপায়ে তারা বহু জমির মালিক হয়েছে এবং অনেকে কিছুদিনের মধ্যে নিজের মালিকের চেয়ে অধিক বিত্তশালী হয়ে উঠেছে। তবে দু'চারজন জনপ্রিয় নায়েব যে ছিল না তা নয়; তারা ছিল অনেক সহনশীল। নায়েবদের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদের নাম ছিল গোমস্তা। এদের আমরা হিসাবরক্ষক করনিক বলতে পারি। এরা জমিদারী সেরেস্তার জমা খরচের হিসাব লিখত। খাজনা আদায় করত এবং নায়েববাবুদের ফায়ফরমাস খাটত। নায়েবের অবর্তমানে এরা নায়েবি করত এবং এদের প্রতাপও বড় কম ছিল না। এরাও নায়েব বাবুদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরিবারের লোকজন নিয়ে এসে সুন্দরবন অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করেছে। জমিদারী শাসনযন্ত্রের সর্বনিম্ন পদে ছিল পেয়াদা, এরা ছিল শক্তিশালী লেঠেল। এরা লাঠি চালনা জানত। এদের কাজ ছিল অনেকটা আজ্ঞাবাহী দারোয়ানের বা দূতের মত, এরা নায়েব গোমস্তার আজ্ঞাবাহী। এরা কাছাড়ির

বিষয় সম্পদ পাহারা দিত এবং নায়েব গোমস্তা বাবুরা যখন যাকে ধরে আনতে বলত তখন তাদের প্রয়োজন হলে শারীরিক বল প্রয়োগ করে ধরে নিয়ে আসত। আইন শৃঙ্খলাভঙ্গকারীদের প্রহার করত। আর অন্য সময় গাঁজা বা মদ প্রভৃতি নেশা করে অঘোরে পড়ে থাকত। এরাও কালক্রমে স্থায়ীভাবে সুন্দরবনের অধিবাসী হয়ে গেছে। আর লস্কর বলতে আমরা চাকর বাকর বা গৃহভৃত্য বুঝি। এরা রান্না-বান্না থেকে আরম্ভ করে সব রকম কাজ করত এবং কাছারিতে থাকত। এরা ছিল সব থেকে নিরীহ প্রকৃতির লোক। এরাও কিছুদিন থাকার পর বিয়ে করে বংশ বিস্তার করে এবং এদেরই কেউ কেউ আবার স্ত্রী ও ছেলেপুলে নিয়ে এসে বাস করতে করতে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছে।

এইসব শ্রেণীর লোক ছাড়া কিছু সমাজ বিরোধী চোর, ডাকাত, ফেরার আসামী, খুনী প্রভৃতি লোক নিজেদের আত্মগোপন করার জন্য যোগাযোগ হীন এই সুন্দরবন অঞ্চলে এসে নিরাপদে বাস করত। তারা ক্রমে ক্রমে এই অঞ্চলের অধিবাসী হয়ে গেছে। কতিপয় স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি পরবর্তীকালে আত্মগোপন করে এই অঞ্চলে বসবাস করত, তারাও পরে স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছে। আর পূর্ববঙ্গের হিন্দু মুসলমান রায়টের সময় কিছু উদ্বাস্তু সরকারি ব্যবস্থাপনায় কলোনি স্থাপন করে থাকার ব্যবস্থা করায় এখন তারা স্থায়ীভাবে এখানকার বাসিন্দা। আবার কিছু লোক বিভিন্ন ব্যবসার উদ্দেশ্যে এসে এখানে স্থায়ীভাবে আছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে এ-অঞ্চলের আদিম আদিবাসীরা খুব উন্নত শ্রেণীর মানুষ ছিল না। তারা স্বাভাবিক কারণেই ছিল সমাজ বিরোধী ও অত্যাচারী প্রকৃতির লোক। এদের শিক্ষা সংস্কৃতি যেমন ছিল না তেমনই নিচুমানের ছিল এদের নৈতিক চরিত্র। এখনও জানা যায় এ অঞ্চলে বর্তমান যারা খুব বিত্তশালী জোতদার শ্রেণীর লোক তাদের পূর্বপুরুষগণ হয় ডাকাতি বা রাহাজানি করত নয়ত নীতিহীন অত্যাচারী নায়েব বা গোমস্তা ছিল। সুন্দরবন অঞ্চলে যেমন কিছু কিছু সমাজবিরোধী ব্যক্তি এসেছিল তেমনই তাদের পাশাপাশি কিছু নারী বিভিন্ন চকদার, লাটদার, নায়েব, গোমস্তার রক্ষিতা হিসেবে থাকার জন্য এসেছিল। তাদের গর্ভের অনেক সন্তানও পরে এই সব নায়েব, চকদার, লাটদারের অনুগ্রহ লাভ করে এখানে স্থায়ী-ভাবে বসবাস করেছে। কারণ তারা আর সভ্য সমাজে ফিরে আসতে পারেনি। তবে স্বাধীনতা লাভের কিছু আগে বা ঠিক তারপরে এই অনুন্নত ও অবহেলিত সুন্দরবন অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের ফলে বিভিন্ন স্থানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল স্থাপিত হয়েছে। আগে যখন পরস্পর বসবাস ও বিবাহাদির ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছে তখন কিছু কিছু পাঠশালা গড়ে উঠেছিল। সেখানে মোটামুটি আক্ষরিক জ্ঞান দেবার জন্য কিছু লোক মেদিনীপুর থেকে এসে পাঠশালায় পণ্ডিতগিরি করেছে। তারা একটু লেখাপড়া জানায় সকলের শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করেছে এবং বেশ কিছুদিন থাকার পর জমি জায়গা সস্তা দামে

কিনে বসবাস করতে করতে স্থায়ী হয়ে গেছে। তারপর যখন সরকারি প্রচেষ্টায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে তখন ডিগ্রীধারী স্কুল- ফাইন্যাল থেকে বি. এ, এম. এ, পর্যন্ত শিক্ষকদের বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে। অথচ স্থানীয় কোনও উপযুক্ত ডিগ্রীধারী ব্যক্তি না থাকায় মেদিনীপুর, হাওড়া এবং পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু অধ্যুষিত অঞ্চলের বহু সংখ্যক মানুষ সুন্দরবন অঞ্চলে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত এসেছে এবং যোগাযোগের অসুবিধার জন্য তারাও অনেকে সুন্দরবন অঞ্চলের স্থায়ী অধিবাসী হয়ে গেছে। বর্তমান সুন্দরবন তাই বহু শ্রেণীর মানুষের আবাস স্থল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতা-পূর্ব সুন্দরবনে প্রধানত দুই শ্রেণীর লোক বাস করত চকদার এবং বর্গাদার। চকদাররা ছিল বিত্তশালী ভূস্বামী আর বর্গাদাররা ছিল ভূমিহীন কৃষক। আর স্বাধীনতা-উত্তর যুগে জমিদারী প্রথা বিলোপ হওয়ার পরে লাটদার বা চকদার আইনত আর কেউ নেই। এখন আছে ছোট বড় জোতদার আর বর্গাদার। বর্গাদারদের এখনও সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়নি। এরা ছাড়া বহিরাগত শিক্ষক, চিকিৎসক, চাকুরিজীবি ও ব্যবসায়ী এখন সুন্দরবন অঞ্চলে স্থায়ী ও অস্থায়ী হিসাবে বাস করে। জোতদারদের প্রধান জীবিকা ধান ও মাছের চাষ। এদের ছেলেমেয়েরা এখন চাকুরি করে জীবিকা অর্জন করছে। বর্গাদারদের ভাগ্যে জমি চাষ ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। এদের ছেলেমেয়েরা এখনও উচ্চ শিক্ষা লাভ করার কোনও সুযোগ পাচ্ছে না। এখনও তাদের অনাহারে অর্দ্ধাহারে কালাতিপাত করতে হয়। দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না। তবে পয়সা পেলেই বাজে নেশায় পয়সা নষ্ট করে, অনেকের নিজস্ব বাড়ি নেই, অন্যের আশ্রয়ে থাকে, সরকারি জমি বিলি এদের কাছে প্রহসনে পরিণত হয়েছে। সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীতে বর্গাদারদের যে অবস্থা ছিল. বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সে অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। তার প্রধান .কারণ, আগে সুন্দরবনে লোক সংখ্যার তুলনায় ধান, মাছ, দুধ সবই বেশি উৎপাদিত হত, তাই সবাই দুবেলা পেট ভরে খেতে পেত। এখন প্রকৃতিও খুব কৃপণ, বর্গাদাররা মাথা খুঁড়েও সারা বৎসরের জন্য কোনও কাজ পায় না, তাই বৎসরের নয় মাস কোনওরকম একখানা রুটি, কোনওদিন আটা, কোনওদিন বা অনাহারে কাটিয়েই দিন গুজরান করছে তারা। এ অঞ্চলের বর্গাদারদের বর্তমান সংখ্যা মোট জন সংখ্যার প্রায় ৭৫ ভাগ। এবং বর্গা হিসেবে দু'তিন বিঘা জমির চাষ করলে এদের সারা বছরের খাদ্যের সংস্থান হতে পারে না। কারণ এখানে বিঘা প্রতি গড় ফসল নয়, দুই বিঘা জমি চাষ করে একজন বর্গাদার .৭৫ ভাগ হিসাবে সাড়ে-সাত থেকে সাড়ে-আট মন ধান পেতে পারে। এতে আবার তার চাষের হাল, লাঙল এবং বীজ ধানের খরচ আছে। কায়িক শ্রম তার নিজের, এর জন্য কোনও খরচ করতে হয় না। এই পরিমাণে কিন্তু

পরিবারের নূন্যতম সংখ্যা ৫/৬ জন থাকলে তার সংস্থান হওয়া উচিত নয়। হয়ও না। ফলে হয় নদীতে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করে মাছ ধরতে গিয়ে প্রাণ হারায়, না হয় জঙ্গলে কাঠ কাটতে কী মধুসংগ্রহ করতে গিয়ে বাঘের উদরপূর্তির শিকার হয়। হয়ত সকলে প্রাণ হারায় না, কিছু লোক কপাল জোরে প্রাণে বেঁচে কাঠ মাছ মধু নিয়ে ফিরে আসে। এতে কিছু দিন তাদের সংসার চলে।

সুন্দরবনের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবন এক মিশ্রজীবিকার উপর নির্ভর করে। এরা শুধু ধান চাষ নয়, কাঠ, মাছ ও মধু সংগ্রহ করেও জীবিকা অর্জন করে। সুন্দরবনের নোনা মাটিতে একটি মাত্র ফসল বছরে একবার ফলে। তাই এরা এই সহকারি জীবিকার আশ্রয় জীবনের বিনিময়েও গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এ-পেশা বহুলাংশেই ঝুঁকি নির্ভর। অথচ সুন্দরবনের এ-সব পেশার মানুষের জন্য যদি কাঠ ও মধু সংগ্রহের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়, মাছ ধরার যদি নিরাপদ ও উন্নত ব্যবস্থা করা যায় এবং অন্যান্য বনজ এবং সমুদ্র-সম্পদ সম্বন্ধে এদের প্রশিক্ষণ ও উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা হয় তাহলে সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের জীবন ও জীবিকার উন্নতি ঘটতে পারে। এ ছাড়া কৃষির জন্য চাই অনুকূল ব্যবস্থা। চাই উন্নত সেচ ব্যবস্থা-পেশাগত বৃত্তির উন্নতি ও ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের মাধ্যমে সারা বছরের কর্ম সংস্থান ও উপার্জনের ব্যবস্থা। তা হলে স্বাভাবিক ভাবেই এ-অঞ্চলের মানুষের জীবন যাপনের মান যেমন উন্নত হয়ে উঠবে তেমনই জীবিকার দ্বারও উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

মানুষের জীবনের মান ও জীবিকা অনুসারে তাব সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে উঠে। স্থান কাল ভেদে মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তাই প্রাচ্যের সমাজ সংস্কৃতি পাশ্চাত্যের সমাজ সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। খ্রীষ্টানদের সঙ্গে মুসলমানদের পার্থক্য আছে। আবার মুসলমান সভ্যতার সঙ্গে হিন্দু সভ্যতার পার্থক্য আছে। আর্য সভ্যতার সঙ্গে অনার্য সভ্যতারও যথেষ্ট ব্যবধান। সুতরাং সুন্দরবনের অনুন্নত আদিবাসী অধ্যুষিত স্থানের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা অন্যান্য উন্নত জাতের ও উন্নত মানের অধিবাসীর থেকে নিম্ন স্তরের হওয়াই খুবই স্বাভাবিক। তবে সুন্দরবন অঞ্চলে প্রাচীন উন্নত সমাজ ব্যবস্থা ছিল। তার বহু প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ বর্তমানে আবিষ্কৃত হয়েছে। সুন্দরবনে যে সব প্রাচীন কীর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে তার সবই প্রায় পাল ও সেন যুগের। গুপ্ত যুগেরও কিছু কিছু মুদ্রা প্রভৃতি নির্দশন পাওয়া গেছে। গুপ্তযুগের পর যে মাৎস্যন্যায় তা আমরা ভারতের যে কোনও ইতিহাস পড়লেই জানতে পারি। তারপর শুরু হয় পাল রাজত্ব। সুন্দর বনের ১১৬নং লাটে যে ১০০ ফুট উচ্চ জটার দেউলের সন্ধান পাওয়া গেছে, তা পাল যুগে নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরের কাছে যে তাম্র লিপি পাওয়া গেছে তার থেকে জানা যায় এই মন্দিরটি ৯৭৫ খৃষ্টাব্দ নির্মিত হয়েছিল। পাল যুগের পর শুরু হয় সেন যুগ। যতদূর জানা যায় আলিপুর, ফলতা, কুলপি প্রভৃতি সেনরাজ্য ভুক্ত ছিল। সেন রাজত্বের

পতনের পর আরম্ভ হয় পাঠান যুগ। ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে নির্মিত শাহী মসজিদ বসিরহাটে এখনও পড়ে আছে। পাঠান যুগের পর মোগল যুগ। এ সময় সুন্দরবনের উত্তরাঞ্চলে মোগল শাসন প্রবর্তিত হলেও দক্ষিণাংশ ছিল গহন অরণ্যে পরিপূর্ণ। এই অঞ্চলে মগ ও ফিরিঙ্গি জলদস্যুর ঘাঁটি ছিল। এদের নিদারুণ অত্যাচারে ভাগীরথীর নিকটবর্তী জনপদগুলি ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছিল। যতদূর জানা যায়, ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ২টি ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ে সেই সুন্দরবন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সে সময়ের সুন্দরবনে যে সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ছিল কালক্রমে তা লুপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তী যুগে সুন্দরবনে আবার নতুন জনবসতি গড়ে ওঠায় এক নূতন সংস্কৃতির সংযোজন ঘটেছে। এই নূতন সংস্কৃতিভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলেছে প্রধানত অসংখ্য আদিবাসী। এরাই ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি বহু নিম্ন শ্রেণীর উপজাতি। এদের জীবন যাপন প্রণালী, আচার আচরণ পুজোপদ্ধতি সবই নাগরিক সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন। হয়ত সম্প্রতি কিছু কিছু শিক্ষিত উচ্চবর্ণের মানুষ সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন বৃত্তি নিয়ে বসবাস করছে। কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

সুন্দর বনের নানা জাতি ও ভাষা

নদীবহুল গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ সুন্দরবনে বাস করে নানা জাতি। হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান-খৃষ্টান-ব্রাহ্ম-বৈষ্ণব ছাড়াও উক্ত ধর্মাবলম্বী নানান অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষ। আগেই বলা হয়েছে, জঙ্গল হাসিলের সময় ও তার অব্যবহিত পরে এই অঞ্চলের নায়েব, চকদার, জমিদার বা তাদের লোকজনের রক্ষিতা হিসেবে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে অনেক মহিলা নিয়ে আসা হয়েছিল। সেই সঙ্গে ছিল জঙ্গল হাসিল করতে ও জমির লোভে ছুটে আসা মানুষের দল। এদেরই কেউ কেউ এসেছিল সপরিবারে। ফলে এই সব মহিলা ও রক্ষিতা হিসেবে নিয়ে আসা মহিলাদের উক্ত সম্প্রদায় কর্তৃক বহু অবৈধ সন্তান জন্ম নিয়েছিল। এই সব অবৈধ সন্তান উৎপাদনের ফলে সুন্দরবনে সৃষ্টি হয়েছে বহু উপজাতি ও খণ্ডজাতি। এছাড়া নিরক্ষর সংস্কৃতিহীন সুন্দরবন অঞ্চলে একদা সুন্দরবন বাসীদের কিছু অংশ মুসলমান আমলে ইসলাম ও বৃটিশ আমলে খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হলেও ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে আলাদা সমাজ গড়ে উঠেছে।

বিভিন্ন সময়ে যারা এসেছে ও যারা আছে তাদের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে দেওয়ার চেষ্টা হল।

পদবিধারী অধিবাসী		**জাতি**
অধিকারী	☐	নমঃশুদ্র, পৌণ্ডক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, মাহিষ্য
আড়ি	☐	ব্যগ্রক্ষত্রিয়, কৈবর্ত
ওঝা	☐	কৈবর্ত, মাহিষ্য, ব্রাহ্মণ

কর	☐	উগ্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, ব্রাহ্মণ
করণ	☐	কায়স্থ, কৈবর্ত, মাহিষ্য
খাটুয়া	☐	মাহিষ্য, তিলি
গায়েন	☐	সূত্রধর
গিরি	☐	কৈবর্ত, মাহিষ্য, তিলি
ঘোড়ই	☐	সদগোপ, মাহিষ্য
চৌধুরী	☐	কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য
জানা	☐	মাহিষ্য, কৈবর্ত, উগ্রক্ষত্রিয়
ডিণ্ডাল	☐	কৈবর্ত, মাহিষ্য
তিয়াড়ি	☐	ব্রাহ্মণ
দলুই	☐	উগ্রক্ষত্রিয়
দাস	☐	ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, মাহিষ্য, বোদে, নমঃশূদ্র ইত্যাদি
মান্না	☐	মাহিষ্য, কৈবর্ত, তিলি
মাইতি	☐	মাহিষ্য, কৈবর্ত, তিলি
হালদার	☐	পৌণ্ড্র ও নমঃশূদ্র, মাহিষ্য *

সুন্দরবনের মানুষের ভাষা

নানা জাতি, নানা মত ও নানারকম সংস্কৃতি থেকেই জন্ম নিয়েছে সুন্দরবনের মানুষের ভাষা। এদের কেউ কথা বলে পূর্ববঙ্গীয় যশোর খুলনার ভাষায়, যেহেতু দেশভাগের পর এরা এসেছে বাস্তুচ্যুত হয়ে এবং সুন্দরবনের পূর্বদিকের নানা জায়গায় এরা বসতি করেছে। আবার জঙ্গল হাসিলের সময় বিহারের প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে যারা এসেছে সেই সব ওঁরাও মুণ্ডা ও সাঁওতালদের মুখের ভাষা আলাদা। হাওড়া, মেদিনীপুর ইত্যাদি জেলা থেকে যারা এসেছে তাদের ভাষা আবার অন্যরকম। আরও অন্যরকম আবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভাষা। এই সমস্ত রকম ভাষাই বিভিন্ন মানুষের মুখে ঘুরে ফিরে নানান আদল পেয়েছে। মিশ্রিত হয়ে তৈরি হয়েছে এক নতুন ভাষা। উদাহরণ হিসেবে নিচের সারণিতে এ-অঞ্চলের কিছু ভাষার শব্দ ও তার অর্থ তুলে ধরা হল।

সারণি

ভাষার শব্দ	শব্দের অর্থ
নাল	লাল
নেকি	ন্যাকা মেয়ে
ভোর ভোর বা ভোন্দোম	পুরোপুরি (সম্পূর্ণভাবে)

* পদবির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস ☐ খগেন্দ্রনাথ ভৌমিক

ভাষার শব্দ	শব্দের অর্থ
হ্যেঃ	ঢঙ
কন্সলা	বরফের মতো ঠাণ্ডা
কালা	কালো রঙ বা কানে খাটো
কালা	প্রেমিক
খালি খালি	বারবার
ওদ	রোদ
রাসর	আসর
রূপেন	উপেন
কেদারা	কেমন ধারা (কী রকম ব্যাপার)
ওন্দারা	অমন ধারা
নাগাতি	মতো
প্যানা	মতো
পানা	মতো
নাবি	শেষ সময় অর্থে (নাবি পক্ষের ছেলে>অসময়ের ছেলে)
পোঙা	পাছা
নাতি	লাথি
ভোতর	ভেতর
বোট করা	ঠাট্টা করা
ফুঁক্	ফুঁ
ফটোক	ফটো
ধৈপে ধৈপে	টুঁ মেরে মেরে (একটু একটু করে)
দেবড়ে	দৌড়ে
ঘেবড়ে	দমে যাওয়া
রগড়	রঙ্গ বা ঠাট্টা
খেদো	খাঁদা
ঘেতোমি	আলসেমি
পুরুষ্টু	পুষ্ট
নুড়কো পেনা	টুকটাক কাজের যোগ্য
থিইয়ে	ডিঙিয়ে যাওয়া
ন্যাওটা	আদুরে
গুট বেগুন	টোমাটো
গু আঁড় কেল বা গুহেড়কেল	গোসাপ

ভাষার শব্দ	শব্দের অর্থ
মুলোন	জলনিকাশী মুখ
কাকালি	কোমর
কিরে	দিব্যি
খত	ক্ষতিপূরণ
নাড়ি ঠিক নি	নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ঠিক নেই
চিঠে	চিঠি
খেলোমি	চ্যাংড়ামি
খলোমি	হিংসুটে পনা
খিল লাগা	নিঃশ্বাস আটকে যাওয়া
মিটিন	মিটিং
নোক	লোক
মাওলা	মামলা
নেড়ি	ন্যাড়ামাথশ মেয়ে
গেঁড়ি	ছোট মেয়ে
মৌজা	ঢেউ
পাকিট	প্যাকেট
উষোল	উনুন
বাজ্জে	পায়খানা
গুইড়ে	কুড়িয়ে
উব্জে	আপন গরজে (নিজের ইচ্ছায়)
পুঁচে	মুছে
ওগড়ে	রগড়ে
ইন কুমারি	এন কোয়ারি [Enquiry]
ফেচ্‌কানো	গোপনতা ফাঁস করে দেওয়া
তুরির	তোর
উরির	ওর
খর	তড়বড়ে
খর খর	তাড়াতাড়ি
ঘড় ঘড়া	কফ্‌
পান্তা খেকো বেলা	সকাল বেলা
গরম খেকো বেলা	দুপুর
সাঁজ	সন্ধে

ভাষার শব্দ	শব্দের অর্থ
বুকির ব্যাটারি	ফুসফুস
হোড়া	জল তোলপাড় করা
ঘুরমুচে	ফচকে
আখ্ খুটি	হাঘরে হ্যাংলা মেয়ে
ছাবাল	ছেলে
নোলা	লোলা
নাঙন	লাঙন
মিছ্ছা	মিথ্যে
সুমুন্দি	শ্যালক
চাঁড়ি	চড়া মেজাজ
কচি	বাচ্চা
আঁবোশ্যে	অমাবস্যা
পাঁচা	চাঁদা
গব্নো	গর্ভবতী [গৃহ পালিত পশুর ক্ষেত্রেই সাঃ ব্যবহৃত শব্দ]
লতা	সাপ
ব্যঞ্জন	তরকারি
গজাং করে	ঝপ করে
গোকলে	গরুর মতো কায়দা
গল্লা	গলদা
বোল্লা	বোলতা
ঘুগরো	ঝিঁঝি পোকা
দুদি	দুধে
চুলি	চুলে
গুড়ির	গুড়ের
দুদির	দুধের
সুফল	সৎভাবে
কাটা জামা	দর্জির তৈরি জামা
করতি	করিতে
খাতি	খাইতে
যাতি	যাইতে
আলি	আইলে

(স্বরসঙ্গতির নিয়ম অনুসারে অধিকরণে ও সম্বন্ধে উ-এ এর জায়গায় উ-ই, ইর হয়।) [দুধে, চুলে, গুড়ের, দুধের]

আবার স্বরসঙ্গতির কারণে অসমাপিকা ক্রিয়াপদের অন্ত্য ‘এ’-র জায়গায় ‘ই’ হয়। [করিতে, খাইতে, যাইতে, আইলে]

ভাষার শব্দ	শব্দের অর্থ
করলি	করিলে
কেটি	কেটে
ভাসতিঠে	ভাসছে
তুল্যে	তুলে
পের	পার (পার করা)
বলবু	বলব
গ্যাস	গন্ধ
তর	তোর
ক্যেটি যাচ্ছু ?	কোথায় যাচ্ছ ?
শুন্	শোন
কুস্তে	হেঁতাল গাছের পাতায় তৈরি ঝাঁটা
মট্টে	মোটে
মইর্যে/ চইল্যে	মরে/ চলে
কাম	কাজ
সেঠি	সেখানে
লে আসতি	নিয়ে আসতে
কত্ত্	কত
এঠি	এখানে
থেক্তি	থেকে
চালাম	চাইলাম
অগ্রে	আগে
পাইছু	পেয়েছো
আপুনার	আপনার
ধুয়েৎ	ধুয়ে
হোয়ল	হোল
কিন্যে খাবু	কিনে খাব

দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাষার শব্দ ও তার অর্থ [যে অর্থের শব্দগত রূপ [illegible] পমালায়]

টেইন	টাইম (time)
বাউ	বাপু
চুক করে বয়	চুপ ক'রে বস
ত্যাংকোন	ততক্ষণ

ভাষার শব্দ	শব্দের অর্থ
কোমেন্দে	কেমন করে বা কোথায়
ন্যাসি	নিয়ে আসি
ঝন্তন্না	যন্ত্রণা
হ্যাই দ্যা	ঐ দেখ
লাট ফরোম	প্ল্যাটফর্ম
ডান বাগে	ডান দিকে
ফোকর	ফুটো
রাবাদে	তাবাদে
ভালতি পাচ্ছি	ভাবতি পারছি
শুইদে	শুধিয়ে (জিজ্ঞেস করে)
কান্টক	কাণ্ড
ন্যায়	নিয়ে আয়
অফা কোইরে ল্যাও	রফা করে নাও
অলেহ্য	অন্যায্য
বিক্কিরি	বিক্রি
তকরার	তর্ক
কত্তিছিস	করছিস [তকরার কত্তিছিস]
চাঁড়িজ্জে	চাটুজ্জে
রাসরে	আসরে
শোদলম	জিজ্ঞেস করলাম
অত বড্ডি	অত বড়
রদিকারী	অধিকারী
উরোত	উরু
দুস্কির	দুঃখির
চাপট	চাপড়
খালে	খেল (খেয়ে ফেলল)
ব্যাদনা	বেদনা
দুরাদেষ্ট	দুরদৃষ্ট
ছিষ্ট	সৃষ্টি
জন্ম বেতা	জন্ম ব্যথা
কোতা	কথা
অই	রই / থাকা
ক্যান্ ল্যা	কেন রে

ভাষার শব্দ	শব্দের অর্থ
তাপর	তারপর
কোচ ছাওয়াল	ছোট ছেলে
নোক্‌কান্তপুর	লক্ষ্মীকান্তপুর
রোস্তাদ	ওস্তাদ
রাড়াই	আড়াই
আগ	রাগ
কাচ্চে	কাস্তে
চাল খাপ্‌ড়া	ছাল চামড়া
ঝিনি	যিনি
ঝে	যে
ঝন্তনা	যন্ত্রণা
এয়েছ্যালো	এসেছিল
লাইট	নাইট (Night)
হোল্লাইট	হোল-নাইট (Whole Night)
এন্তারা	এমনতর
রুশ্চারণ	উচ্চারণ
সামত্থি	সামর্থ
ওই মো	ওদিকে
হোই মো	ওদিকে
সেই মো	সেদিকে
এ্যাল গাড়ি	রেল গাড়ি
ঝ্যাতকোণ	যতক্ষণ
সব্বাঙ্গ	সর্বাঙ্গ
শিঙে	সেলাই
ছামা	ছায়া (Shadow)
বাতাল্লি	ছোট নৌকা

[illegible]

[যেমন দু'জন মানুষ লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনের কোনও রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ট্রেনের দেখা নেই। একজন ইতিমধ্যেই অস্থির হয়ে উঠেছে। সে নিজেই টিকিট কেটে নিতে চায়। কেননা তার ধারণা, টিকিটটা কাটলেই ট্রেন এসে পড়বে। নিচে এই সামান্য বিষয়টিকেই দু'জনের কথোপকথনের মধ্যে তুলে ধরা হল]

■ হাই গো, বড় ভাই এ প্পান বিড়ি খাতি খাতি হো হোল্লাক হোইয়ে পড়লম। বলি, ঝে টেরেনে আম্‌গার যেতি হবে তার আর টেইন কত বলো দেই?

■ আরে, বাউ, কী টেইন টেইন কত্তিছিস? মনে কোল্লি তেনে ম্যোগরাহাট পেইটি দিতি পারি। চুক কোরে বয় দেই।

■ আহ্য, অত আগ কল্লি কি চলে গা বড় ভাই। তা ত্যাৎকোন দেইকে দাও না, টিকুটি কোমেন্দে করে—আমি বোঁ কৌইরে গে পো কইরে দু কোন টিকুটি কেইটে ন্যাসি—

■ আঃ ভাল্লা ঝন্তন্না! হাই দ্যা হাই সামনে—তেনে লাট ফরোম দেখ্তি পাচ্ছিস-ঐ লাটফরোম পেইরে-হোই দোয়রের ভোতরে তেনে ঢুকবি-ডান বাগে দেখতি পাবি রাপিণ্ডির দোকানের (আফিং-এর দোকান) নাগাত্তি গুটি দুই ফোকর আছে। সেই ফোকরের মদ্দি হাত গইলে বাবুরি টিকুটি দিতি বলবি। পয়হা কড়ি আচে তো ঠিক?

■ হ্যাঁ বড় ভাই, সে কি আর তুমি আমারে বোলে দেবে। হাই গো রিস্টিশান বাবু-(লোকটি দৌড়ে যেতে যেতে বলে) দু কোন টিকুটি কেইটে দ্যাও দেই—

লক্ষ্যনীয়, শব্দ ব্যবহারে উচ্চারণে এই জেলার কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। সেগুলি হল—

'ন' কারের জায়গায় 'ল' কার এসেছে
'ল' কারের জায়গায় আবার 'ন' কার
'অ' কারের জায়গায় 'র' কার এসেছে
'র' কারের জায়গায় আবার 'অ' কার
এছাড়া 'জ + য' কারের জায়গায় 'ম' কার উচ্চারিত হয়েছে।

সুন্দরবনের উদ্বাস্তু বসতি ও বসতি অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা

১৯৪৭ সালের দেশবিভাগে পর যে বিপুল সংখ্যক ছিন্নমূল উদ্বাস্তু, ওপার বাংলা তথা তৎকালিন পূর্ব-পাকিস্তান থেকে এদেশে চলে এসেছে তাদেরই এক অংশ হাজারে হাজারে পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় বসতি স্থাপন করেছে। কোথাযও নিজেরা বসেছে। কোথায়ও সরকারি তরফে তাদের বসানো হয়েছে। তবে বেশির ভাগ লোকই এসেছে হাসনাবাদ-বসিরহাট অঞ্চলে। কেননা কাছাকাছি উক্ত বঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) সীমানা থাকায় এই ছিন্নমূল উদ্বাস্তুর স্রোত কাছাকাছি এই সব অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছে। এ ছাড়া এদেরই এক অংশ চলে এসেছে গোসাবায়। এরা সবাইই প্রায় এসেছে যশোর ও খুলনা থেকে। জাতিতে এরা রাজবংশী ও মালো সম্প্রদায়। এদের জীবিকা মাছ ধরা। জঙ্গলে গাছ কাটা ও মধুর সময়ে মধু সংগ্রহে যাওয়া।

এ ছাড়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে এইসব উদ্বাস্তুর দল এসে আশ্রয় নিয়েছে। এদের এক অংশ এসেছে রাধানগরে। জীবনধারণের খাতিরে নতুন পরিবেশ ও নয়া-অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার মধ্যে তারা লড়াই করে টিকে রয়েছে এবং এখানকার জীবন-যাত্রায় নিজেদের অংশীদার করে তুলেছে। তবুও লড়াইয়ে

হেরে যায়নি। এরকমই এক পুনর্বাসন-বসতি হল দক্ষিণ ২৪-পরগণা জেলার বাসন্তী থানার ঝড়খালি ও লস্করপুরে। পূর্বে বিদ্যা নদী, পশ্চিমে মাতলা ও দক্ষিণে হেড়োভাঙা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে এই ঝড়খালি ও লস্করপুর। এই দুটি জায়গার কথা বলা হল এই কারণে যে, এক আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা চালিয়ে দেখা হয় যে পুনর্বাসনের পর উক্ত উদ্বাস্তুরা সুন্দরবন অঞ্চলের নতুন পরিবেশেও অর্থনৈতিক সংগ্রামে কীভাবে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে।

সমীক্ষা চালানো হয় নিম্নলিখিত পর্যায়গুলিকে ঘিরে— ১. জাতি ২. ধর্ম ৩. জাতপাত ৪. আদি বাড়ি ৫. স্থানান্তর ৬. ঘরের আকার ৭. বয়স ৮. শিক্ষা ৯. পেশা এবং ১০. বিবাহ ইত্যাদি।

সমীক্ষায় দেখা যায়, এই দুই অঞ্চলের মানুষ এসেছে খুলনা ও বরিশাল থেকে। খুলনা থেকে শতকড়া ৭০.৫৯ ভাগ এবং বরিশাল থেকে শতকড়া ২৩.৯৮ ভাগ।

শতকড়া ৯৩.৬৭ ভাগ মানুষই হল তপসিলি জাতির। এদের প্রতি ১০০ জন পুরুষে ৯৮ জনই হল মহিলা। এসব অঞ্চলে এদের ঘরগুলি, তৈরি হয়েছে বেশির ভাগই গরান ও পশুর কাঠের খুঁটি থেকে। নিচে মাটির মেঝে ও চালায় হেঁতালের পাতা ছাওয়া। খুব কমই দেখা গেছে (শতকড়া ২ ভাগ) ঘরের ক্ষেত্রে বাঁশ, মাটি ও খড় ব্যবহার করেছে।

এদের প্রধান খাদ্য ভাত। এ বাদে যেমন যা পায়। পানীয় জল সংগ্রহ করে দ্বীপের মিষ্টি জলের পুকুর থেকে। যে-সমস্ত রোগে এরা প্রায়ই অসুস্থ হয় সেগুলি হল—**সর্দি-কাশি, জ্বর, পেটখারাপ ও আমাশা, অম্ল, কৃমির প্রাদুর্ভাব, বসন্ত, কলেরা, স্কিন-ডিজিজ, চুল-পড়া, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, মাথা ধরা ইত্যাদি**—। বিনা পয়সায় চিকিৎসা পেলে এরা চিকিৎসা ব্যবস্থায় উৎসাহী হয়। নয় তো টোটকা-টাটকা ও ঝাড়ফুঁক।

প্রেম-ভালোবাসা ও যৌনতায়ও এরা সমান উৎসাহী। মেয়েরা বিয়ে করে ১২ থেকে ১৫/ ১৬-এর মধ্যে। পুরুষরা ২০ থেকে ২৪-এর মধ্যে।

নেশার মধ্যে দিশি মদ এরা ব্যবহার করে। এ ছাড়া বিড়িই চলে বেশি। কেউ কেউ হেঁতাল পাতা মুড়ে বিড়ি বানিয়ে খায়।

এদের পেশা মাছ ধরা ও মধু সংগ্রহ। এখানকার শতকড়া ৭০ ভাগ মানুষের মতে মাছ এখানে প্রচুর। ফলে মৎস চাষ এখানে অনায়াসে করা যেতে পারে। এছাড়া ধান-কল, বরফ কল, নুন শিল্পও এখানে হতে পারে। এ ছাড়া আছে গোল পাতা, কাঠ ও মধু।

সাধারণ জীবিকা যেমন আছে তেমনই এই জীবিকাকে ঘিরে আছে মহাজনের আনা গোনা। সাধারণ মানুষ জীবিকার প্রয়োজনেই তাই এদের খপ্পরে পড়ে। প্রায় সবাইই প্রয়োজনে ধার নেয়। ধারের উৎস: **ক) মহাজন খ) প্রতিবেশী গ) আত্মীয়-স্বজন ঘ) দোকান [জিনিস পত্র ধার] ঙ) বন্ধু ও অন্যান্য।**
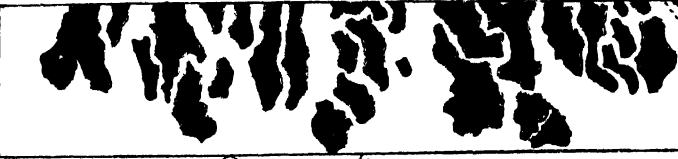
সুন্দরবনের প্রত্নতাত্ত্বিক ও পর্যটন কেন্দ্র এবং তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

প্রাকৃতিক নিয়মেবই সুন্দরবনেব ভূ-স্তব তার জন্ম লগ্ন থেকেই বারবার ডুবেছে এবং জেগে উঠেছে। তারই ফলে এ-অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন। তবে ভূ-গর্ভ থেকে উদ্ধার হওয়া কিছু কিছু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন এ-অঞ্চলের যে প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দেয় তা থেকেই এই বনাঞ্চলের প্রাচীন পুরাকীর্তিগুলির সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রাচীন সুন্দরবন এখনও মাটির নিচে। বারবার এখানে ভূমি-নিমজ্জন যেমন ঘটেছে তেমনই জঙ্গল আর অরণ্যে ভরে উঠেছে এই জেলা। জানা যায় পরিবেশ অনুকূল ছিল বলেই প্রাচীন সুন্দরবনে হাতি ও গণ্ডার বিরাজ করত।

ষোড়শ শতাব্দীতে প্রতাপাদিত্যের সময়ে সুন্দরবন ছিল বিরাট এক জন বসতি। প্রতাপাদিত্যের পতনের পর মগ দস্যু ও পর্তুগীজের উৎপাতে এই অঞ্চল আবার জনশূন্য হয়ে পড়ে এবং অরণ্যে পরিপূর্ণ হয়। এ-অঞ্চলের বহু প্রান্তে জঙ্গলের ভেতরে, নদী ও খাঁড়ির পাড়ে এবং গ্রামের ভেতরে অনেক ভাঙা মন্দির এখনও সুন্দর বনের প্রাচীনত্ব বহন করছে। ১৮৯০ সালের ১১ই মে, একশ বছর আগে ইংরেজি দৈনিক Statesman পত্রিকায় একজন ইংরেজ পর্যটক, Sheppared তাঁর **"The ruined city of sundarbans"** নামে একটি রচনায় এই প্রাচীন পুরাকীর্তির কথা উল্লেখ করেছিলেন এভাবে—

Slowly all gathereg as close as they could on the branches of the banyan tree to see this some thing. Yes, there before us lay the ruins, here a dome, there the Flat terrace, now and again as the trees swayed in the wind could be seen a solitary piller of oriental shape, then an old half-ruined horse-shoe arch."

এখানে সংক্ষেপে এ অঞ্চলের কিছু পুরাতাত্ত্বিক কেন্দ্রের উল্লেখ করা হচ্ছে যেগুলি এখনও সুন্দরবনের প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক কেন্দ্র

১] জটার দেউল: রায়দীঘির পাড়ে মণি নদীব ধারে ৫/৬ মাইল উত্তর পূর্বে মাঠের পর মাঠ বা ধান ক্ষেতের মধ্যে প্রায় তিন বিঘা উঁচু জমির উপর এক বিরাট মন্দির। এরই নাম জটার দেউল। হাজার বছরের প্রাচীন মন্দির

এই জটার দেউল, মন্দিরের ভিত মাটির নিচে কিছু বসে গেছে। তবুও এখনও প্রায় আশি ফুট দীর্ঘ আকৃতি নিয়ে বহু ক্রোশ ব্যাপী উন্মুক্ত প্রান্তরে সে আজও প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আশ্চর্য! দিনের পর দিন এই লবণাক্ত অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর দুর্যোগ অবহেলা উপেক্ষা করে জটার দেউল প্রায় অক্ষত দেহে আজও দাঁড়িয়ে। কেবল এর মাথার দিকটা ১৯০৮ সালে ইংরেজ আমলে তৈরি। শোনা যায় মন্দিরটির চুড়োর মধ্যে ধনরত্ন আছে ভেবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোনও কর্মচারি ওটি ভাঙেন। মন্দিরটির প্রবেশ দ্বার পূর্ব দিকে, উচ্চতা প্রায় ১৬ ফুট। মন্দিরটির তলদেশ চতুষ্কোণ, গর্ভগৃহ প্রবেশ দ্বার থেকে প্রায় ৬ ফুট নিচে। ভেতরে সিঁড়ি আছে। সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয়। এই দেউলের কোনও কোনও জায়গায় এখনও পোড়ামাটির শিল্পকার্য দেখা যায়। বর্ধমানের ইছাই ঘোষের দেউল ও বীরভূমের বহু লাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। জটাধর শিবের নামানুসারে মন্দিরটির নাম জটার দেউল হয়েছে বলে অনেকের অনুমান।

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংরেজ সরকার সুন্দরবনের এই অংশ জঙ্গলমুক্ত করার সময় জটার দেউলটি দেখতে পায়। সে সময় সরকারি প্রচার থেকে জানা যায় ঐ মন্দিরের মধ্যে বহু কঙ্কাল এবং একটি ৮/৯ বছরের বালকাকৃতি মূর্তি ছিল, কিন্তু পরবর্তী কালে এই মূর্তি মন্দিরে দেখা যায়নি। সে কারণে জটার দেউল হিন্দু, জৈন না বৌদ্ধ দেবতার তা আজও নিঃসন্দেহে বলা যায় না। স্থানীয় প্রবাদ এটি শিবের মন্দির। জটার মন্দিরের কাছে সংস্কৃত ভাষায় লেখা বা খোদিত একটি তাম্রপট্টলি পাওয়া যায়। তা থেকে জানা গেছে, ঐ দেউলটি ৮৯৭ শকাব্দে (খ্রীঃ ৯৭৫ সালে) রাজা জয়ন্তচন্দ্র তৈরি করেছেন।

তবে সরকারি পরিচয় থেকে জয়ন্তচন্দ্র সম্পর্কে এর বেশি আর কিছু জানা যায় না। ইতিহাস থেকে জানা যায় পালরাজাদের সময়েই দক্ষিণ-বঙ্গের কোনও কোনও স্থান চন্দ্রবংশীয় রাজাদের অধীনে ছিল। জটার দেউলের কাছে একটি স্থানে কয়েকটি আরোহীসহ হাতির মূর্তি দেখা যায়। জটার দেউলের এক মাইল দূরে ছাতুয়া নদীর তীরে একটি বিরাট ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়।

২] **ভরত গড়:** ভরত গড় বা ভরত রাজার গড় একেবারে চব্বিশ পরগনা সুন্দরবনের পূর্ব সীমান্তে। জটার মৌজা থেকে সাত আট মাইল দূরে। এখানে কয়েকটি স্তূপ দেখা যায়। বৃহৎ আকারের ওই স্তূপ দুটি সম্পর্কে স্থানীয় মানুষরা বলে, ওর একটি ভরত রাজার প্রাসাদ, অপরটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। এর কিছু দূরে আর একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এর নাম 'বিরিঞ্চির মন্দির'। স্থানীয় একটি খালের পাড়ে একটি দূর্গের ও দূর্গ প্রাচীরের লুপ্ত প্রায় ধ্বংসাবশেষ কিছু দেখা যায়। তা থেকে ভরত রাজার বিষয় জানা গেছে। তিনি পাল রাজাদের সামন্ত নৃপতি ছিলেন। পরে পাল যুগের পতনের কিছু আগে

স্বাধীনভাবে এই অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। ভরত গড় থেকে বুদ্ধদেবের মূর্তি পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, ভরতগড়ে ও তার কাছাকাছি স্তূপগুলি বৌদ্ধ বিহার বা মঠের ধ্বংসাবশেষ। আরও জানা যায় চব্বিশ পরগনার এই উত্তর-পূর্ব অংশে পালযুগে বৌদ্ধদের প্রাধান্য ছিল। বৌদ্ধযুগের বিখ্যাত কলাগুা বিহার (বর্তমান এই জেলার বসিরহাট মহকুমার মধ্যে) এই অঞ্চলের মাইল কুড়ি দূরে ছিল।

৩] জয়নগর স্টেশন থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে মনি নদীর এ পাড়ে **রায়দীঘি** ও নদীর অপর প্রান্তে **কঙ্কনদীঘি** রায়দীঘি নদীর পূর্ব তীরে। রায়দীঘি নাম হয়েছে এখানকার বিরাট দীঘি থাকায়। দীঘিটি এখনও আয়তনে প্রায় একশ বিঘা, চারদিকের পাড় ১৫ থেকে ২০ ফুট উঁচু। রায়দীঘির কাছ থেকে একটি বুদ্ধদেবের ও একটি জৈন তীর্থংকর পার্শ্বনাথের মূর্তি-প্রস্তর পাওয়া গেছে। কঙ্কনদীঘি ঝোপে-ঝাড়ে ও ছোট ছোট স্তূপে ভরা। এখানে কয়েকটি বড় বড় দীঘি আছে, সেগুলি প্রায় শুকনো. আগাছায় ছেয়ে ফেলেছে। এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে পাঁচ ফুট উঁচু সুন্দর একটি বিষ্ণুমূর্তি ও নবগ্রহ প্রস্তর ফলক। ফলকটি প্রস্থে প্রায় সাড়ে তিন ফুট ও উচ্চতায় দেড় ফুট; এগুলি পাল যুগের বলে জানা যায়।

৪] রায়দীঘি থেকে মাইল তিনেক পশ্চিমে **নলগোড়া**। এখানে জঙ্গল হাসিলের পর নদীর তীবে কয়েকটি স্তূপ দেখা যায়। বৃহৎ স্তূপটি 'মঠবাড়ি' বলে পরিচিত। এর উচ্চতা প্রায় ত্রিশ ফুট ও তলদেশের বিস্তৃতি সাড়ে তিন বিঘার মত। কিন্তু বর্তমানে ক্রমশ ক্ষয় পেয়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। এই মঠবাড়ির কিছু দূরে একটি বড় পুকুর আছে। এটি আয়তনের প্রায় ৪০ বিঘা। নলগোড়া থেকে পাঁচটি ছোট ছোট ব্রোঞ্জের ও দুটি পাথরের মূর্তি এবং একটি বিচিত্র হংসাকৃতি ও হংসমূর্তি খোদিত প্রস্তরফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। ব্রোঞ্জে তৈরি মূর্তিগুলির মধ্যে একটি বৌদ্ধদেবী হারিতির, অপর দুইটি বিষ্ণুর ও উমা মহেশ্বরের, পাথরের ছোট মূর্তিগুলি কোন দেবতার বোঝা যায় না।

এখান থেকে কিছু দূরে নলগোড়া ও মণি নদীর মধ্যে চন্দ্রকেতুর গড়ের মতো সুউচ্চ ও প্রশস্ত দীর্ঘ পাঁচ মাইল ব্যাপী (দুর্গ) প্রাচীর দেখা যায়। তবে মাঝে মাঝে এর অংশ বিশেষ লুপ্ত হয়ে গেছে। তবুও কিছুকাল আগেও এই প্রাচীরের উচ্চতা ছিল ২০ থেকে ২৫ ফুট, তলদেশে বিস্তৃত ছিল ১০০ ফুটের কাছাকাছি। খাড়ির কাছে এই প্রাচীরের উচ্চতা প্রায় ৪০ ফুট। 'যশোহর ও খুলনার ইতিহাস' এ এই প্রাচীরকে প্রতাপাদিত্যের মনিদূর্গের প্রাচীর বলা হয়েছে। কিন্তু কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে, প্রাচীরটি হিন্দুযুগে তৈরি। কালিদাস দত্ত লিখিত 'প্রাচীন যুগে পশ্চিম সুন্দরবন' এ এই মতের সমর্থন মেলে। কিন্তু স্থানীয় মানুষের অনুমান, এই দুর্গ আসলে 'জয়রাম হাতীর' গড়। জয়রাম ছিলেন

প্রতাপাদিত্যের একজন দূর্গরক্ষক।

এই দূর্গ বা গড়ের কাছাকাছি মনি তট নামে একটি গ্রাম, এখান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে একটি দূর্লভ শিবমূর্তি। মূর্তিটি ধাতুতে তৈরি। পাদপীটে বৃষের মূর্তি উৎকীর্ণ ভগবান শিব পদ্মের উপর দাঁড়িয়ে আছে। দক্ষিণ বাহুভঙ্গ---বামবাহু ত্রিশূলের উপর স্থাপিত, সারা অঙ্গে বহু অলংকার, উম্মুক্ত নভস্থলের নিচে লিঙ্গ মূর্তি। বিগ্রহটি গুপ্তযুগের উচ্চাঙ্গ ধাতুশিল্পের পরিচয় দেয়।

৫] **মইপীঠ ও ছেলবাড়ি :**এ গ্রাম দুটি, জটার দেউল থেকে দক্ষিণ-পূবে ঠাকুরাণ নদীর কিছু দূরে। মইপীঠ গ্রামে কয়েকটি বৃহৎ স্তূপ আছে। এখানে কিছুকাল আগেও একটি প্রাচীনকালের প্রস্তর আসন (জল চৌকির মত) ছিল, এখন দেখা যায় না।

দেলবাড়িতে জঙ্গলের মধ্যে কয়েকটি বাড়ি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। দেলবাড়ি সংলগ্ন পল্লী মাধবপুর থেকে ব্রোঞ্জের একটি সিংহবাহিনী দুর্গার মূর্তি পাওয়া যায়।

মনি নদীর কিছু দূরে মাইল খানেকের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রপুর থেকে একটি কুবেরের মূর্তি এবং কাছাকাছি গ্রাম জলঘাটা থেকে গরুড় স্তম্ভের শীর্ষাংশ আবিষ্কৃত হয়েছে।

৬] **ছত্র ভোগ :**প্রাচীন যুগের একটি তীর্থস্থান ও বন্দর। এখন তার কোনও চিহ্নই দেখা যায় না। এ জায়গায় গঙ্গা নদীর ধারা বহুদিন শুকিয়ে গেছে। তবে মধ্যযুগে প্রবল ছিল। সে বিষয় জানা যায় ঐ সময় ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী প্রাচীন কাল থেকে বিখ্যাত। এঁর প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। কেউ কেউ বলেন মন্দিরটি সেনযুগে তৈরি ছিল। ছত্র ভোগের কাছাকাছি চক্রতীর্থ ও পাতাল গঙ্গা ঐতিহাসিক গুরুত্ব পূর্ণ দ্রষ্টব্য স্থান।

৭] **বাইশ হাটা বা ঘোষের চক পল্লী :**এখানে একটি বিরাট ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়, উচ্চতায় প্রায় ৩৫ ফুট, তলদেশের বিস্তৃতি ৪/৫ বিঘা। কারও কারও মতে, এটিও মঠবাড়ি। এই বাইশ হাটার মঠবাড়ি ও নল গোড়ার মঠবাড়ির পরিচিত স্তূপগুলি, বৌদ্ধ বা জৈন মঠের ধ্বংসাবশেষ, এবং হাজার বছরেরও বেশি প্রাচীন ও সম্ভবত এটি প্রাচীন পালযুগের হওয়াই সম্ভব।

৮] **পাথর প্রতিমা :**পুরাবস্তু সমৃদ্ধ গ্রাম। এখান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে বহু হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন দেব-দেবীর মূর্তি।

৯] **রাক্ষস খালি :**সুন্দরবনের দক্ষিণতম অংশের একটি দ্বীপ। সপ্তমুখী বা গঙ্গার একটি শাখা নদী এ দ্বীপটিকে প্রায় ঘিরে বেখেছে। এই দ্বীপে সুন্দরবনের লুপ্ত সভ্যতার বহু নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে। এখানে দেখা যায় চিত্রখোদিত প্রস্তর খণ্ড। বহু ধ্বংসস্তূপ বৌদ্ধ মঠ বা অট্টালিকার পোড়া মাটির তৈজসপত্র। বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই দ্বীপটির বিষয় আলোচনা ও অনুসন্ধান শুরু করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্রশালা (মিউজিয়াম) কর্তৃপক্ষ ওই দ্বীপে অনুসন্ধান চালিয়ে

মহামূল্যবান ওই তাম্রশাসন আবিষ্কার করেন।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষভাগে (মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব-কালে) পূর্ব খাটিকা বা খাড়ি মণ্ডলের সামন্ত নৃপতি ডোম্মন পাল বঙ্গাধিপতির সঙ্গে বিদ্রোহ করে নিজ শাসন সীমায় (খাটিকামণ্ডলে) স্বাধীন মহারাজা হন। আলোচ্য তাম্রশাসনটি ডোম্মনপাল দেবের একটি ভূদান ব্যাপারে ১১১৮ শকাব্দে (খ্রীঃ ১১৯৬ সালে)। তৈরি হয়েছিল বলে মনে করা হয়—

১০] **কাকদ্বীপ :**গঞ্জ-শহর। এখান থেকে কিছুদূরে আদি গঙ্গা নদীর শাখা কালনাগিনীর কাছে পাকুরতলা গ্রাম থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। কুষাণ যুগের পোড়ামাটির মস্তকখণ্ড, গণেশের বিগ্রহ, আর পোড়ামাটির সীল (সেনযুগে প্রচলিত) বাংলা অক্ষর খোদিত, ব্রাহ্মি অক্ষর খোদিত ফলক (এর উপর হাতীর চিত্র আছে) কয়েকটির তলদেশ ঢালু। স্বর্ণকারদের ব্যবহৃত মূর্তির (অনুরূপ বা পয়রা গুড়ের নাগরীর খত) জলপাত্র, এই পাকুরতলার কাছে পুকুরবেড়িয়া গ্রামের মহাদীঘিতে প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ কিছু দেখা যায়।

১১] কাকদ্বীপ গ্রামের পূর্ব-উত্তরে **করঞ্জলি, কাঁটাবেনিয়া, ঘাটেশ্বরা** প্রভৃতি গ্রামে জৈন যুগের বহু নিদর্শন দেখা যায়। সেগুলির মধ্যে কাঁটাবেনিয়ার জৈন তীর্থংকর পাশ্বনাথ ঘাটেশ্বর গ্রামের আদিনাথের মূর্তি দুটি ও করঞ্জলি গ্রামের স্তম্ভটি উল্লেখযোগ্য। এটির শিল্পশৈলী দেখে জৈন মন্দিরের বলে মনে হবে।

১২]**সাগরদ্বীপ** (বা গঙ্গাসাগর সঙ্গমতীর্থ) রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণে এবং মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যে এ-দ্বীপ তীর্থক্ষেত্র ও মহর্ষি কপিলের সাধনাসিদ্ধির স্থান বলেই উল্লেখ আছে মাত্র। আর্য সাহিত্যে এ অঞ্চলকে 'রসাতল' 'পাতাল' এবং এ স্থানের অধিবাসী সকলকে 'ম্লেচ্ছ' বলা হয়েছে। তার কারণ সাগরদ্বীপ অঞ্চল পূর্ব ভারতের এমনকি সমতটের অন্য স্থান অপেক্ষা নিচু ছিল। সে সময়ে এর অধিবাসীরা ছিল আর্যেতর। সগর রাজার অশ্বমেধযজ্ঞ, ইন্দ্রের অশ্ব হরণ, কপিলের অভিশাপে ষাট সহস্র পুত্র ভস্মীভূত হওয়া প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী যুক্ত এই দ্বীপ।

বর্তমানের এই সাগর দ্বীপের মধ্যে **মাহিশবাড়ি, হরিণবাড়ি, মন্দিরতলা,** প্রভৃতি জায়গা থেকে বহু প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে। বিশেষ করে **মন্দিরতলা** গ্রাম থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে—স্বর্ণ অলংকার, স্বর্ণ-ইষ্টক বা ইষ্টকাকৃতি স্বর্ণখণ্ড এ-দ্বীপের **সুমতি নগরের** মাটির নিচে দেখা গেছে বহুগৃহের ধ্বংসাবশেষ।

সুন্দরবনের ভূখণ্ডের মাটির নিচে যে কয়েকটি নগরী সমাধিস্থ আছে, তার উল্লেখ মধ্যযুগের পর্তুগীজদের খ্রীঃ ১৫৪০ অব্দের মানচিত্র ও বিবৃতি থেকে জানা যায়। 'যশোর খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থে লেখক সতীশচন্দ্র মিত্র সুন্দরবনের অনুসন্ধান ভ্রমণে পাঁচটি লুপ্ত নগরীর সন্ধানের কথা বলেছেন। পর্তুগীজ ডি, বারোস সম্পাদিত মানচিত্রে দেখানো কয়েকটি লুপ্ত নগরীর বিষয়ে পরে কোনও

কোনও প্রত্নতত্ত্ববিদ জেনেছেন, পর্তুগীজ ডি বারোসের নক্সা বা মানচিত্রটি খ্রীঃ সপ্তদশ শতকে সম্পাদিত এবং লুপ্ত নগরীর নামগুলি পর্তুগীজ ভাষায় লিখিত। সে কারণ বিকৃত মনে হলেও স্থানগুলির দু-একটির সন্ধান পাওয়া যায়। সুন্দরবন সীমার মধ্যে। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতক থেকে কয়েক শতক 'গঙ্গারিডি' গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ (বর্তমান চব্বিশ পরগনার ভূখণ্ড ঐ দ্বীপের পশ্চিম দক্ষিণতম অংশ বিশেষ) জুড়ে বাস করত। তাদের রাজধানী ও বন্দর 'গাঙ্গে' ছিল সাগর দ্বীপের গঙ্গাসাগর সঙ্গমস্থল বা তার কাছাকাছি কোনও জায়গায়। গ্রীক ভৌগোলিক টলেমির (খ্রীঃ ১ম-২য় শতকে) সম্পাদিত মানচিত্র এই 'গাঙ্গে' বা গঙ্গানগরের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমার যে নির্দেশ দেওয়া আছে, তা থেকে তার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে এরকম ধারণা করা যায়।

ত্রিপুরার রাজাদের পূর্বপুরুষ মধ্যভারত থেকে এসে প্রথমে এই গঙ্গাসাগর দ্বীপে বা এ অঞ্চলে বহু কাল বা বংশপরম্পরায় বাস ও রাজত্ব করতেন। পরে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে কিরাতদের রাজ্য অধিকার করেন। তখন ঐ রাজ্যের নাম হয় ত্রিপুরা। এইগুলির উল্লেখ আছে ত্রিপুরা দরবারে রক্ষিত রাজরত্নাকার পুঁথি বা রাজাদের কুলুড়ি গ্রন্থে। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখিত 'বাংলার ইতিহাস' গ্রন্থে এই বিষয়ের স্পষ্ট সমর্থন দেখা যায়।

উক্ত ইতিহাসে একটি মানচিত্রে দেখানো আছে, প্রাচীনকালে বঙ্গোপসাগর কূল পর্যন্ত স্থান ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ছিল। মধ্যযুগেও সাগরদ্বীপ উন্নত স্থান

ছিল——মহারাজা প্রাতাপাদিত্যের দ্বিতীয় রাজধানী ও নৌ বন্দর ছিল। পর্তুগীজ পাদ্রিরা সাগর দ্বীপকে 'চান্ডিকাল' ও মহারাজা প্রতাপাদিত্য 'কিং অফ চান্ডিকাল' বলতেন। (সে সময় বোধ হয় প্রতাপাদিত্যের কুলদেবী চণ্ডীর নাম যুক্ত কোনও শব্দে এই দ্বীপ অভিহিত হতো) সাগরদ্বীপ প্রতাপাদিত্যের দ্বিতীয় রাজধানী হওয়াও সম্ভব। কারণ জানা যায় যে, যশোর ধুমঘাটা থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ডেরই তিনি অধিপতি ছিলেন এবং এ সমগ্র ভূখণ্ডে অবস্থিত চব্বিশ পরগনা, খুলনা জেলার জায়গার পরিচয় ছিল যশোর রাজ্যের অংশ বলে। কোনও স্থান বা ভূ-ভাগের নাম খুলনা বা ২৪ পরগনা ছিল না। নাথধর্ম বহু প্রাচীন, এ ধর্মে সিদ্ধাচার্য মৎস্যেন্দু নাথ (মহারাজ দেবপালের সময়) এই সাগরদ্বীপবাসী ছিলেন।

চন্দ্রদ্বীপের রাজা দনুজ মর্দনদেব, সাগরদ্বীপ ও বঙ্গোপসাগরকূলের বহু স্থান অধিকার করেন। সুন্দরবন থেকে তাঁর মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে শকাব্দ খোদাই করা আছে ১১৩৯ (খ্রীঃ ১৪১ অব্দ) কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেন, রাজেন্দ্র বেলে খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীতে গঙ্গরাষ্ট্র বা সাগরদ্বীপের গঙ্গারিডিদের রাজধানী ও বন্দর ধ্বংস করেছিলেন।

১৩]**হরিনারায়ণপুর :** ডায়মণ্ডহারবার মহকুমা শহর থেকে ৫/৬ মাইল দক্ষিণ পূর্বে হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত এই বসতি একটি সাধারণ গ্রাম। কিন্তু সম্প্রতি ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে মহামূল্যবান। এ গ্রামের পশ্চিমে হুগলি নদীর তীর ভেঙে গেলে পাওয়া যায় একেবারে আদিম যুগ থেকে মৌর্য শুঙ্গ কুষাণ গুপ্তযুগের বহু নিদর্শন। এখান থেকে পাওয়া যায় আদিম যুগের প্রস্তরের হাতিয়ার কুঠার, মশলা পেষণের চৌকি, হাড়ের তীর-ফলক, রৌদ্র শুষ্ক মাটির তৈজসপত্রাদি, গুলতি, কবচ, প্রভৃতি। সেগুলি থেকে তিন চার হাজার বছরের বেশি প্রাচীন কালের নিদর্শন পাওয়া গেছে। পরবর্তীকালের পোড়ামাটির ফলকগুলির উপর খোদিত চিত্রে প্রাচীন কালের গ্রীক-মিশর শিল্পের প্রভাব দেখা যায়। কয়েকটি গোলাকৃতি ক্ষুদ্র ফলক বা সীলে খোদিত দেখা যায়—দুটি মানবমূর্তি, যাদের মুখাকৃতি পাখির মতো তীক্ষ্ণ, পরিচ্ছদ ও ভঙ্গি মিশরীয়। এখানে অর্ধচন্দ্রাকৃতি বা শৃঙ্গাকৃর্তি শিরোভূষণ প্রাপ্ত তাম্রের ও রৌপ্যের জিনিসপত্র পাওয়া যায়।

পর্যটন কেন্দ্র

জল-জঙ্গলের দেশ এই সুন্দরবন অঞ্চলকে অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সরকারি তরফে ইতিমধ্যেই নানা উদ্যোগ শুরু হয়েছে। কেননা নদী-খাঁড়ি ও সাগর এবং ম্যানাগ্রোভময় দ্বীপমালা সমৃদ্ধ, বন্য-জন্তু পরিবৃত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অনবদ্য এই সুন্দরবন পর্যটকদের কাছে চির আকর্ষণীয়। যেমন পূর্বপ্রান্তে তেমনই দক্ষিণে—সারা সুন্দরবনে ছড়িয়ে আছে এমনই অনেক পর্যটন কেন্দ্র। নিচে সেরকমই কিছু কেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

নামখানা □ গঞ্জ শহর। খুবই ছোট। হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নদীর পাড়ে এই জায়গাটি মূলত দক্ষিণে সুন্দরবনের 'সিংহ দরজা' বলা যায়। কেননা এখান থেকে হাতানিয়া দোয়ানিয়া নদী ধরে বড়তলা নদীতে পড়ে চেমাগুড়িতে নেমে সাগরদ্বীপে যাওয়া যায়। অন্যদিকে এখান থেকেই হাতানিয়া নদীর বাম-প্রান্ত ধরে সপ্তমুখী নদীতে পড়ে **'কুমির-প্রকল্প'** থেকে **লুথিয়ান দ্বীপ, বুড়োবুড়ির তট, কলস দ্বীপ** ইত্যাদি দেখে আসা যায়। পৌষ সংক্রান্তির সময় সাগর মেলার তীর্থযাত্রীরা এখান থেকে লঞ্চে বা নৌকায় সাগরসঙ্গমে যাত্রা করে। আবার এখান থেকেই নদী পেরিয়ে সোজা রাস্তায় 'বকখালি' যাওয়া যায়।

বকখালি □ বঙ্গোপসাগরের উপকূলে একটি সৈকতাবাস। আগে কাছাকাছি এক খালে প্রচুর বক জাতীয় পাখি এসে ভিড় করত। সম্ভবত তা থেকেই 'বকের খাল' বা 'বকখাল' বা 'বকখালি' নাম হয়। সমুদ্রের পাড়ে উন্মুক্ত বালিয়াড়ি, সমুদ্র তট এবং দীর্ঘ ঝাউয়ের সারি সমৃদ্ধ বকখালি পর্যটকদের কাছে এক মনোরম স্থান। এখানে বিভিন্ন প্রজাতির প্রচুর কাঁকড়া, ও নানারকম পাখি দেখতে পাওয়া যায়। আগে হরিণও আসত। এখন জঙ্গলের দিকে চলে গেছে।

ফ্রেজার গঞ্জ □ পূর্বনাম নারায়ণতলা। ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার হুগলি নদীর মোহনায় অবস্থিত একটি দ্বীপ। এর পশ্চিমে হুগলি নদী। পূর্বে সপ্তমুখী। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। উত্তরে নামখানা। এখানেও বালিয়াড়ি ও সমুদ্রতটের মনোরম শোভা পর্যটকদের কাছে আজও আকর্ষণীয়। ১৯০৩ সাল থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে তৎকালীন

বাংলার লেফেন্যান্টি গর্ভনর, স্যার অ্যাণ্ড্রু ফ্রেজার এই দ্বীপের জঙ্গল সাফাইয়ের কাজে হাত দেন। এখানে একটি কাছারিও গড়ে তোলেন। এ কারণে দ্বীপটি ফ্রেজারগঞ্জ নামে পরিচিত। আজও এই গঞ্জ-দ্বীপে কাছারির সামনে লম্বা লম্বা কয়েকটি নারকেল গাছ ফ্রেজারের স্মৃতি বহন করছে।

ভগবৎপুর ▫ সপ্তমুখী নদীর পাড়ে এই জায়গায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন দপ্তর-এর প্রতিষ্ঠিত 'কুমির প্রকল্প'। নামখানা থেকে প্রায় ৭/৮ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত এই প্রকল্পে জঙ্গল থেকে কুমিরের ডিম সংগ্রহ করে এনে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ফোটানো হয়। তারপর বাচ্চা বড় করে আবার জঙ্গলে ছাড়া হয় অথবা বাইরে পাঠানো হয়। সমস্ত পদ্ধতিটিই এই প্রকল্পে দেখানো হয়েছে। এছাড়া একটি মিউজিয়ামও আছে এখানে। অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে মার্চের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত এখানে প্রতিদিনই পর্যটকদের ভিড় থাকে।

সাগর দ্বীপ ▫ হুগলি, মুড়িগঙ্গা বা বড়তলা নদী ও বঙ্গোপসাগরের মাঝে অবস্থিত এই দ্বীপ ভারত বিখ্যাত সাগর মেলার জন্য বিখ্যাত। প্রতি বছরই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ এই মেলায় আসে মকর সংক্রান্তির দিনে সাগরে পুণ্যস্থানের উদ্দেশ্যে। এখানে কপিলমুনির আশ্রম ছাড়াও আছে সাগরের প্রশস্ত বেলা ভূমি। সাগর মেলা ছাড়াও অন্যান্য সময়েও এখানে আসেন পর্যটকরা। এ বছর (১৯৯৭) প্রায় ৪ লক্ষ মানুষের সমাগম হয় এই মেলায়। অনেক বিদেশীও আসেন।

জম্বুদ্বীপ ▫ বঙ্গোপসাগরে বকখালির দক্ষিণ-পশ্চিম আর সাগর দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বে এই দ্বীপের অবস্থান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মোড়া এই দ্বীপে যাওয়াটা অবশ্য অত সহজে হয় না। এই দ্বীপে যেতে গেলে প্রথমে নামতে হবে বকখালি, নামখানা বা ফ্রেজার গঞ্জে। সেখান থেকে মোটর লাগানো নৌকা (ভুটভুটি) ছাড়ে। তবে বকখালি টুরিস্ট লজের সামনের খাল (বকখালি) ধরে হেনরি আর ফ্রেডরিক দ্বীপের মধ্যে দিয়ে নৌকো (ভুটভুটি) আস্তে আস্তে সমুদ্রে পড়ে। তখন সামনে অপূর্ব শোভা। একপাশে সমুদ্রের জলরাশি আর অন্যপাশে সোনালি সমুদ্র-সৈকত। চারপাশে তারই ফাঁকে চোখে পড়বে অসংখ্য মাছ ধরার নৌকা ও আকাশে ওড়া অজস্র পাখি। গাঙ-শালিক ও নানা ধরনের মাইগ্রেটাবি বার্ড। বকখালি থেকে দ্বীপে পৌঁছুতে সময় নেবে প্রায় সাড়ে-তিন থেকে পৌনে চার ঘণ্টা।

কলস দ্বীপ ▫ পশ্চিমবঙ্গের একবারে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে অবস্থিত এই দ্বীপ। সুন্দরবনের শেষ ভূখণ্ড। পাশাপাশি এরই কাছে আছে হ্যালিডে ও বিজেয়াড়া দ্বীপ।

বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে চুলকাটি ব্লকের পাঁচ নম্বর কম্পার্টমেন্টের দক্ষিণে, পূর্ব দিকে লবণাম্বু উদ্ভিদের সবুজ জঙ্গল শেষে বালিয়াড়ি সমৃদ্ধ দ্বীপটির নামই

কলস। এই দ্বীপের দক্ষিণে সমুদ্র, পুবে মাতলা নদী, উত্তরে টুলি-ভাসানি নদী। দ্বীপের বুক চিরে চলে গেছে করঞ্জ, নারকেলতলা ও বুলচেরি খাল। ২৪৮৫৪ আয়তন বিশিষ্ট এই দ্বীপটি দেখতে কলসির মতো। ভেতরের গভীব জঙ্গলে এখানে বাঘ আছে। পানীয় জলের মিষ্টি পুকুরও এখানে আছে।

গোসাবা □ ক্যানিং-এর কাছে এই দ্বীপ পর্যটকদের খুবই পরিচিত নাম। বলা হয়, গরু, সাপ ও বাঘের আদ্যাক্ষর নিয়েই নাকি একদা 'গোসাবা' নামের উৎপত্তি। এই দ্বীপ সাজিয়েছিলেন কিন্তু এক ইংরেজ। নাম তাঁর ডানিয়েল হ্যামিলটন। তিনি এখানে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেছিলেন। এমনকি তাঁর নিজস্ব কারেন্সি পর্যন্ত চালু করেছিলেন তিনি এখানে। একসময় এখানে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এসেছিলেন। হ্যামিলটনের কাছারির পাশে এক পাথরের ফলক এখনও সে সাক্ষ্য বহন করে। ছোট গঞ্জ শহর গোসাবায় বেড়িয়ে যেতে খুবই মজা। কাছাকাছি আছে রাঙাবেলিয়া। এখানে 'টেগোর সোসাইটি' রয়েছে। রয়েছে 'সাত জেলিয়া' ও দূরে 'ছোট মোল্লাখালি'।

সজনে খালি □ সজনে খালি গোমর নদীর পাড়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন দপ্তরের ব্যাঘ্র প্রকল্পের জন্য বিখ্যাত। এখানে দুটি 'ওয়াচ টাওয়ার' আছে। এই টাওয়ার করা হয়েছে উপরে উঠে বাঘের গতিবিধি জানার জন্য। এ ছাড়া সজনে খালিতে 'পাখিরালয়' আছে। জুন জুলাই মাসে এখানে প্রচুর বিদেশী পাখি দেখা যায়। তবে পাশে সুধন্যখালি, নেতি ধোপানি প্রভৃতি অঞ্চল 'ডেঞ্জার

জোন’ বলে পরিচিত। এখানে চারপাশের জঙ্গলে বাঘ আছে প্রচুর পরিমাণে। হরিণ, বাঁদরও আছে। আর আছে জলে কুমির।

বাঘনা ফরেস্ট □ বিদ্যার নদী ধরে আরও পূর্বদিকে। এখানকার মনোরম সৌন্দর্য যে কোনও পর্যটককেই সহজেই কাছে টানবে। তবে জঙ্গলে কোর এরিয়া এখানেও আছে।

সুন্দরবনের লোকশিল্প, মেলা ও উৎসব

লোকসংস্কৃতির অন্যতম উপাদন লোকশিল্প। প্রকৃতি, পরিবেশ ও পবিবর্তনশীল যূথবদ্ধ জীবনচর্চার সচল প্রবাহে তার বিকাশ। সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপে বিভিন্ন জাতির জীবনযাপনের পাশাপাশি তাই গড়ে উঠেছে এই লোকশিল্প। নিচে তারই কিছু পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

পট

গ্রামীণ মানুষেব পটশিল্প চর্চার ইতিহাস অনেকদিনের। ভাবতবর্ষের অনেক জায়গায়, এমন কি ভারতবর্ষেব বাইরেও পট-শিল্পের প্রসারেব কথা জানা যায়।

সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলেও পট শিল্পীদের সন্ধান পাওয়া গেছে। সাগর দ্বীপের কয়লাপাড়ায়, সুমতিনগর, হারাধনপুরে কয়েক ঘর পটিদার আছে। এরা গোটানো পট আঁকে। অবশ্য সব সময় নয়। এদের একএকজনের পেশা এক একরকম। অবসর সময়ে বা অর্ডার পেলে এরা পট আঁকে।

পাথর প্রতিমার লক্ষ্মীনাবায়ণপুর, ভাগবতপুর গ্রামে, কয়েকঘর পটিদার আছে। এসব পটের বিষয় মনসা, চণ্ডীমঙ্গল, রাম-লক্ষ্মণ-সীতার কাহিনী বর্ণন ইত্যাদি। কাকদ্বীপের কয়েক ঘর পটিদারের সন্ধান পাওয়া যায়। সুন্দরবনের পটের ধারার সঙ্গে মিল পাওয়া যায় মেদিনীপুরের পটশিল্পের। লম্বা কাপড়ের পেছনে কাগজ লাগিয়ে পটের পটভূমি তৈরি করা হয়। তারপর বিভিন্ন রঙেব মিশ্রণে তৈরি হয় ছবি। আগে পটিদাররা গাছের ছাল, পাতা, ফল ইত্যাদি থেকে রঙ তৈরি করত। এখন প্রয়োজনে রঙ কিনে পটে ব্যবহার করে।

কাঁথা

বাংলার জীবনযাত্রায় কাঁথা শিল্পের ইতিহাস দীর্ঘকালেব। অন্তত কয়েক শ' বছর তো বটেই। বৌদ্ধ যুগের পালি সংস্কৃতি থেকে পাওয়া যায় কাঁথার ব্যবহার যে সময়েও ছিল। অবিভক্ত বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) ফরিদপুর, মৈমনসিংহ, ঢাকা, বরিশাল, যশোহর ইত্যাদি জায়গার নক্শী কাঁথার সুনাম সর্ববিদিত। পশ্চিমবঙ্গের বসিরহাটেও একসময় অনেক সুন্দর সুন্দর কাঁথা তৈরি হত। সাধারণ কাঁথা এখনও গ্রামবাংলার জীবনে অনেক দেখা যায়। কিন্তু সেরকম নক্শী কাঁথার শিল্প এখন প্রায় নেই বললেই চলে। তবু তারই ভেতরে কোথায়ও কোথায়ও আজও পাওয়া যাবে এমন শিল্প। যেমন দক্ষিণ ২৪-পরগনা জেলার সুন্দরবনের পাথর প্রতিমা অঞ্চলে।

মূলত এ-সমস্ত কাঁথা তৈরি করতে নানা ধরনের অনেক সংখ্যক ছুঁচ লাগে। লাগে নানা রঙের সুতো আর অসম্ভব সূক্ষ্মতা। যে সূক্ষ্মতায় এই শিল্প একসময় বাংলার ঘরে ঘরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

আগেই আলোচনা করা হয়েছে, সুন্দরবনের মানুষ তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। একদল তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) চলে আসা মানুষ, অপর দল হাওড়া হুগলি ও মেদিনীপুর অঞ্চলের এবং তৃতীয় দল জঙ্গল হাসিলের সময় বিহারের প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে আসা লোক। মজার ব্যাপার, এখানে, এই বাদা অঞ্চলে স্থিতিশীল হয়ে বসার পর এ-সমস্ত মানুষেরাও তাদের গ্রামীণ শিল্পে এই কাঁথা তৈরি শুরু করেছেন।

উত্তর-সুরেন্দ্রগঞ্জ সুন্দরবনের জন বসতির শেষ ভূখণ্ড। এখানেও দু'তিনটি পরিবারের মহিলাদের এই কাঁথা তৈরি করতে দেখেছি। এদের সবাইই প্রায় ওপার বাংলার খুলনা অঞ্চল থেকে আসা মানুষ।

কাঁথা মূলত বাড়ির মেয়েরাই তৈরি করে। এবং এই শিল্পের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান উভয় ঘরের মহিলাদেরই জীবনের নানা আকাঙ্খাব কথা ছবির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এই ছবি হল কাঁথার নক্শা। এই নক্শায় থাকে গাছ, বাঘবন্দী খেলার ঘর, লতাপাতা, বিভিন্ন পশু-পাখি, ধানের শিস, লক্ষ্মীর পায়ের চিহ্ন নদী, সমুদ্র এমনি আরও কত কী।

শোলা

সুন্দরবনের কোনও কোনও জায়গায় এই শিল্পের প্রচলন আছে। শোলা জলা জায়গায় জন্মায়। এর রঙ তুলোর মতো সাদা। তবে বাইরে অবশ্য-এর গায়ের চামড়ার রঙ মাটির মতো। সেগুলো ফেলে ভেতরের সাদা রঙের শোলাকে আলাদা করে নেওয়া হয় খুব ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে। কেননা শোলা খুবই হালকা। ধারালো ছুরি ছাড়া এদের সমান ভাবে কাটা যায় না। যাই হোক, ওপরের ছালটা ফেলে ভেতরের সাদা রঙের জিনিসটাকে সমানভাবে পাতলা করে কেটে নেওয়া হয়। পবে তাই বানানো হয় নানা জিনিস। বিয়ের টোপর, মুকুট, প্রতিমার গয়না, চাঁদমালা ইত্যাদি।

সুন্দরবন অঞ্চলের কুলপি ও মন্দির বাজার অঞ্চলে এই শোলা শিল্পের কাজ দেখা যায়। তবে এরা সাধারণত বিয়ের টোপর ও প্রতিমার চাঁদমালা তৈরি করে। এছাড়া কিছু কিছু জায়গায়, অর্ডার পাওয়ায় কদম (মালিফুল) তৈরি করতেও দেখেছি।

কাকদ্বীপ, ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চলের শোলা শিল্পীরা ছড়িয়ে আছে। খুবই সাধারণ ও কায়ক্লেশে জীবন এদেব।

শঙ্খ

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের তুলনামূলক বিচারে পশ্চিমবঙ্গেই শঙ্খ শিল্পের প্রচলন ব্যাপকহারে দেখা যায়। এর প্রধান কারণ, হিন্দু বাঙালি রমণীদের হাতে শাঁখা পরার প্রবণতা ও ঘরে ঘরে পুজো পার্বণে শঙ্খধ্বনি। ফলে শঙ্খ শিল্পের চাহিদা বেড়েছে পশ্চিমবঙ্গে। কিন্তু সে তুলনায় শঙ্খ শিল্পীদের কদর বাড়েনি। তার উপর বর্তমান অর্থনীতির হাল-হকিকতে তারা এখন দিশেহারা, ফলে পূর্বপুরুষের জাত ধর্ম ছেড়ে অনেকেই এখন অন্য পেশাবলম্বী। তবুও এরই ভেতরে কিছু কিছু শিল্পী বাঁচিয়ে রেখেছে এই শিল্পকে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কাকদ্বীপ অঞ্চলে কয়েক ঘর শাঁখারি আছে। এদের আদি বাড়ি ছিল অন্য জেলায়। কিন্তু ঘটনাচক্রে কাকদ্বীপে এসে তারা এখন এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত।

অনেক আগে এই শঙ্খ শিল্পীরা হাওড়ার উলুবেড়িয়া থেকে গোল করে কাটা শাঁখের খণ্ড নিয়ে আসত। এখন শঙ্খ ব্যবসায়ীরা ছাল অলা কাঁচা শঙ্খ কেনে কলকাতা থেকে। এক একটা প্রমাণ সাইজের শঙ্খ থেকে ৪/৫ টা করে মোটা শাঁখা বেরোয়। সরু হলে ৭/৮টা করে।

কাকদ্বীপের শঙ্খ শিল্পীরা আগে শঙ্খের ছাল শীলে ঘষে ঘষে মসৃণ করত। এখন করে মেশিনে। সবার অবশ্য মেশিন নেই। কেননা এ ধরনের মেশিনের দাম ২৫০০ থেকে ৩০০০ হাজার টাকা। কাঁচা শঙ্খকে প্রথমে মেশিনে বা শীলে ঘষে শঙ্খের ছাল তুলে ফেলা হয়। তারপর মাসখানেক জলে চুবিয়ে এরপর অ্যাসিড দিয়ে শাঁখের গা মসৃণ ও উজ্জ্বল করা হয়। পরে শাঁখের গায়ে ফাইল দিয়ে ফুল বা ডিজাইন করা হয়। যেসব শাঁখের গায়ে পোকায় কাটা দাগ থাকে, সেগুলো পুডিং দিয়ে মেরে দিতে হয়।

কাকদ্বীপ বাজারে এমনি সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কাজ করে চলেছে শঙ্খ শিল্পীরা। শাঁখারি শিল্পীরা সারাদিন কাজ করে তার দক্ষতা অনুযায়ী মালিকের কাছ থেকে মজুরি পায়। এই মজুরি মাসে ৬০০/৭০০ টাকা।

জয়নগর-মজিলপুরে কিছু শঙ্খ শিল্পী আছে। কিন্তু তারা অবলুপ্তির পথে। কেননা হাতে মূলধন নেই, কাঁচা মাল কিনবেন কি করে? অথচ একদিন এই দক্ষিণ ২৪ পরগনায় কাঁচা মালের অভাব ছিল না। ভাঙড় থানার অন্তর্গত শাঁক সহর নামে একটা গ্রাম আছে। এককালে নাকি এই গ্রামের কাছে বিদ্যাধরী নদী থেকে শঙ্খ ও শামুক পাওয়া যেত। আর শাঁক সহর গ্রামেই বসত সেই সব শঙ্খ বেচার হাট।

অন্যান্য লোকশিল্প

সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলে যে সমস্ত হাতের কাজ অত্যন্ত অবহেলিত হয়েও বেঁচে আছে সেগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঝাঁটা, কুন্তে ও ঝাড়ন। এ

ধরনের কুটির শিল্পের জন্য দরকার হয় নারকেল পাতা, খেজুর পাতা ও পিছে পাতা। পিছে পাতা হল হেঁতাল পাতারই আর এক নাম। একে আবার অনেকে বগুড়া পাতাও বলে।

মথুরাপুর থানার হোকলডাঙা গ্রামে প্রায় ৪০০ ঘরের মতো পরিবার এই ঝাঁটা ও কুস্তে তৈরি করে। এরা কেউ কেউ চাষের কাজও করে। কেউ কেউ পোলট্রির ব্যবসা করে। আবার কেউ কেউ জঙ্গলে মধু কিংবা মোম সংগ্রহে যায়। কিন্তু বাঘের থাবায় প্রাণ যায় অনেকেরই। ঝাঁটা কুস্তের কাজ চলে ভাদ্র থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত। আর এই ঝাঁটা তৈরির জন্য প্রয়োজন হয় পিছে পাতা বা হেঁতাল পাতার। এ অঞ্চলের, এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষ তাই ছোটে জঙ্গলে।

জঙ্গল থেকে পাতা নিয়ে ফিরতে ফিরতে প্রায় দু' সপ্তাহ চলে যায়। তার আগে পাতা কাটার জন্য দেউল বাড়ি ফরেস্ট অফিস থেকে 'পাস' নিতে হয়। নিতে হয় সঙ্গে একজন 'বহরদার' বা 'বাউলে'। অর্থাৎ গুনিন। গুনিন না হলে জঙ্গলে ঢুকবে কি করে। বাঘ আছে না! তাব উপর বনবিবির পুজো দিতে হবে যে। জঙ্গলে ঢোকার আগে একটা জ্যান্ত মুরগিও বনবিবির নামে উৎসর্গ কবে জঙ্গলে ছাড়তে হবে। এর উপর আছে নৌকার ভাড়া। সব মিলিয়ে খরচা করে পিছে পাতা বা হেঁতাল পাতা নিয়ে এসে তা দিয়ে ঝাঁটা কুস্তে তৈরি করে বিক্রির পর যা থাকে তাতে সংসার চলে না। এই সব শিল্পীরা অনেকেই তাই বিভিন্ন পেশায় চলে যাচ্ছে আজকাল। আর যারা অন্য পেশায় নিজেদের মানিয়ে নিতে পারছে না তারা ধুকতে ধুকতে হলেও এই পেশায় নিজেদের এখনও টিকিয়ে রেখেছে।

ঝাঁটা, কুস্তে, ঝাড়ন ছাড়াও সুন্দরবনের কিছু কিছু অঞ্চলে হোগলার মাদুর তৈরি হয়। হোগলা জলা জায়গায় হয় ভালো। কিন্তু এখন আর সেরকম হোগলা পাওয়া যায় না সুন্দরবন অঞ্চলে। তবু তারই মধ্যে মথুরাপুর থানার হোকলডাঙা, জয়নগরের কিছু জায়গা ও রায়দীঘির কোন কোনও অংশে হোগলা হয়।

মেলা ও উৎসব

২৪ পরগনা জেলায় মেলার ঐতিহ্য প্রাচীন কাল থেকে। পাল বা সেন রাজাদের আমল থেকে চলে আসা মেলা বা তারও প্রাচীন মেলাগুলিকে এখন আর আলাদা করে চিহ্নিত করা যায় না। তবে প্রাচীন কাল থেকে যেসব মেলা চলে আসতে আসতে আজও টিকে আছে এবং ১৯৮১ সালের ৩০ শে জুন রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে প্রশাসনিক সুবিধার্থে ২৪ পরগনা জেলাকে উত্তর ও দক্ষিণ এই দু'ভাগে বিভক্ত করার পর দক্ষিণ ২৪ পরগনার অধীনে সুন্দরবন আবাদের প্রচলিত মেলাকেই এই আলোচনায় আনব।

গঙ্গাসাগর মেলা

গঙ্গাসাগর মেলা এই জেলার সুন্দরবন আবাদের শ্রেষ্ঠ মেলা। স্থানীয় পরিচিত ছেড়ে এই মেলা কবে ভারতবিখ্যাত মেলায় রূপ নিয়েছিল তা আর এখন বলা সম্ভব নয়। তবে 'তীর্থ' হিসেবে আলাদা মর্যাদা পাওয়ায় এই মেলার জনপ্রিয়তা ভারত ছেড়ে এখন ভারতেরও বাইরে। গবেষকদের মতে, এই মেলার বয়স প্রায় তিন হাজার বছর। আবার কেউ কেউ সাড়ে তিন হাজারও বলেন। মতামত এবং মতান্তর যাই হোক, এই মেলা যে অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে সে বিষয়ে সবাইই একমত।

ইংরেজি জানুয়ারি মাসে, বাংলা পৌষের মকর সংক্রান্তিব দিনে স্নান ও মেলার অনুষ্ঠান হয় সাগর দ্বীপের সমুদ্রোপকূলে। কপিল মুনির আশ্রমের কাছাকাছি স্থানে— সমুদ্র বেলাভূমি ধরে। এই উপলক্ষেই প্রতি বছর ভাবতবর্ষের জাত ধর্ম নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মানুষ বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই দ্বীপে এসে মিলিত হয় পুণ্য স্নানের উদ্দেশ্যে। সরকারি তরফে এ উদ্দেশ্যে সমস্ত রকম আয়োজন করা হয়। এ আয়োজনের কথায় পরে আসছি। তার আগে একবার চোখ ফেরানো যাক পৌরাণিক সেই এপিসোডের অধ্যায়ে।

পুরাণে কথিত আছে যে মর্তের রাজা সগর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন তাতে ভয় পেয়ে স্বর্গের রাজা ইন্দ্র যজ্ঞের সেই বাধাবন্ধনহীন অশ্বকে কৌশলে চুরি করে এনে সাগরদ্বীপে কপিলমুনির আশ্রমের

সামনে বেঁধে রাখেন। এদিকে অশ্বের নিরাপত্তারক্ষী, সগর রাজার পুত্র ও পৌত্রেরা সেই যজ্ঞের অশ্বের সন্ধানে আশ্রমের সামনে এসে সেই যজ্ঞাশ্বের দেখা পান। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মনে হল এসব ওই মুনির কাজ। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল কপিলমুনির উদ্দেশে কটূকথা বর্ষণ। এভাবেই অশ্রাব্য কথা বলতে বলতে সগরের বংশধরেরা কপিলমুনির ধ্যানভঙ্গ করলেন। কিন্তু ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে মুনি তাদের অভিশাপ দিলেন। অভিশাপে সগর রাজার পুত্র পৌত্রেরা ভস্ম হন। তবে বেশ কিছুকাল পরে তপস্যায় ভগীরথকে তুষ্ট করে সগরের বংশধরেরা মহাদেবের জটা থেকে নির্গত হন। পরে গঙ্গার সঙ্গে প্রবাহিত হয়ে মর্তে অবতীর্ণ হলেন। ভগীরথ শঙ্খধ্বনির সাহায্যে পথ প্রদর্শন করে চললেন আর মকরকে বাহন করে গঙ্গাও বইতে লাগলেন। অবশেষে সাগরদ্বীপে কপিলমুনির আশ্রমের কাছে হাজির হয়ে মা গঙ্গার পুণ্যবারি স্পর্শে এবং মুনিবরের আশীর্বাদে সগরের পুত্র ও পৌত্রগণ বেঁচে উঠলেন।

এই হল পৌরাণিক কাহিনী। এই কাহিনী আজও অমর হয়ে আছে। এবং সেই সঙ্গে কপিলমুনি তথা গঙ্গাসাগর সঙ্গম তীর্থের মাহাত্ম্যও দেশে দেশে প্রচারিত হয়ে আসছে। পুণ্যার্থীরা, গঙ্গা বা ভাগীরথী যেখানে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে সেই গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান করে কপিলমুনির উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন করেন। এই পুণ্যস্নানের অনুষ্ঠানের সময় হল প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তি তথা মাঘ মাসের পয়লা তারিখ— যখন সূর্য মরকরাশিতে প্রবেশ করে।

মেলা বসে সাগর পারে। বালিময় জমিতে। যেখানে হোগলার ছোট ছোট ঘরে দোকান বসে। জিনিসপত্র কেনাবেচা হয়। কিন্তু ধর্মীয় উৎসব থাকে তিনদিন। প্রথম অনুষ্ঠান, মহাসাগর আরাধনা; এই আরাধনা শুরু হয় নানা উপাচারের সাহায্যে। সাধারণত নারকেল, ফল ও ফুল। দ্বিতীয় অনুষ্ঠান, পিতৃ পুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান এবং তৃতীয় অনুষ্ঠান, সাগর স্নান ও কপিলমুনির পুজো। কথায় বলে— "সব তীর্থ বারবার/ গঙ্গাসাগর একবার।" কিন্তু এ-কথা শুধু কথার কথাই নয়। এ কথা বা এর পেছনে যে সব কারণ আছে তার মধ্যে অন্যতম হল, এই তীর্থে যাওয়ার পরিবহন সমস্যা। এই শতাব্দীর পঞ্চাশ দশকের আগে, যখন বাষ্পীয় ইঞ্জিনে রেলে যাতায়াত করতে হত, তখন বেশিরভাগ পুণ্যার্থী হাওড়া রেল স্টেশন থেকে দিশি নৌকায় হুগলি নদীপথে কয়েকদিন কাটিয়ে গঙ্গাসাগর তীর্থে পৌঁছাতেন। ওই যাত্রা ছিল খুবই বিপদসঙ্কুল ও অসহনীয় দুর্ভোগেরই নামান্তর। সেজন্যই বোধহয় পুণ্যার্থীরা নিজের বাড়ি থেকে যাত্রার সময় সবার কাছে বিদায় নিয়ে আসতেন।

এ সবই আমাদের অনেকের শৈশবের স্মৃতির মণিকোঠায় আঁকা রয়েছে। কালক্রমে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় এই তীর্থে যাওয়ার পথ সুগম হয়েছে। সাতের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ বিভাগ প্রতি বছরই

এই মেলা উপলক্ষে মেলা কর্তৃপক্ষের হাতে লঞ্চ এবং কাকদ্বীপ ও সাগরদ্বীপের গঙ্গাসাগর বিশ্রামালয় দুটি দিয়ে আসছে। কেন না তখনও পর্যন্ত এছাড়া আর অন্য কিছু করার উপায় ছিল না। সে সময়ে পুণ্যার্থীরা নামখানা থেকে চেমাগুড়ি ও হাড়উড পয়েন্টের লট নং-৮ থেকে কচুবেড়িয়ায় মুড়িগঙ্গা নদী পার হয়ে সাগরদ্বীপের গঙ্গাসাগর তীর্থক্ষেত্রে পৌঁছুতেন। এরপর পুণ্যার্থীদের লঞ্চ বা নৌকো থেকে ওঠানামার জন্য সেচবিভাগকে ৮ নং লট, কচুবেড়িয়া ও চেমাগুড়িতে ৪টে করে কাঠের অস্থায়ী জেটি তৈরি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। গত '৯৪ সালের মেলা পর্যন্ত এভাবেই সেচ বিভাগের কাজ চলছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত '৯৪ সালে গঙ্গাসাগর মেলার সময় চেমাগুড়ির কাছে মুড়িগঙ্গা নদীতে আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই জলপথ পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির কথা গভীরভাবে চিন্তা করেন।

এ জন্যে গঠিত শ্রীকে এম মণ্ডলের নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের এক তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ সচিব পর্যায়ে ১৭-৮-৯৪ -এর আলোচনার পর ঠিক হয় যে, ৮নং লট থেকে কচুবেড়িয়া হয়ে যথাসম্ভব বেশি সংখ্যক পুণ্যার্থী গঙ্গাসাগর যাবেন এবং নামখানা চেমাগুড়ি জলপথে কম সংখ্যক পুণ্যার্থী ওখানে যাবেন। অন্যান্য সিদ্ধান্তসহ এটাও ঠিক হয় যে কাকদ্বীপ ডায়মণ্ডহারবার রোড থেকে লট নং ৮ পর্যন্ত সংযোগকারী রাস্তা চওড়া করা হবে এবং কচুবেড়িয়া ও লট নং ৮-এর চিরাচরিত কাঠের জেটির পরিবর্তে প্রায় স্থায়ী স্টিল গ্যাংওয়ে সহ নতুন জেটি তৈরি হবে। এ উদ্দেশ্যে গত বছর আগস্ট/সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৯৪) এই জেটি তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয় সেচ ও জলপথ দপ্তরের ওপর। ঠিক হয়, লট নং ৮ ও কচুবেড়িয়াতে ৩টে করে ওই ধরনের জেটি তৈরি করা হবে। যদিও সেচ ও জলপথ দপ্তরের এ ধরনের কাজ করার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না, কিন্তু কাজটা ঠিক সময়ে শেষ করার জন্য প্রায় যুদ্ধকালীন তৎপরতার ভিত্তিতে সমস্ত রকম চেষ্টা শুরু হয়।

প্রথমেই পুরনো রেল সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের রেল দপ্তরে যোগাযোগ করা হয়। অনেক কষ্টে পরে তা জোগাড়ও করা হয়। ইতিমধ্যে ১২ নভেম্বর ১৯৯৪ তারিখে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে একটি বিশেষ বৈঠক হয়। এই বৈঠকে হাজির ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিবহন নিগম, জেলা প্রশাসন, কেন্দ্রীয় অন্তর্দেশীয় জল পরিবহন নিগম ও সেচ বিভাগ। আলোচনা ও পরিদর্শনের পর ঠিক হয়, লট নং ৮ ও কচুবেড়িয়ার ঠিক কোথায় কোথায় জেটি তৈরি হবে।

এর পরই আসল কাজ নির্দিষ্ট জায়গায় শুরু হয়। এই জেটির দুটি অংশ [ক] ফিক্সট্ জেটি (বাঁধ পর্যন্ত ৭৬ মিটার) ও [খ] গ্যাংওয়ে (২০মিটার)। ফিক্সট জেটিতে যে রেল লাইন পাতা হবে তা মাটির কতদূর গভীর পর্যন্ত

ও গ্যাংওয়ের বিভিন্ন অংশের মাপ আকৃতি কেমন হবে, ওই দুই অংশের সংযোগকারী Yoke pin ও stage এর ডিজাইনই বা কী হবে সেজন্য এ দপ্তরের কেন্দ্রীয় ডিজাইন অর্গানাইজেশনের সাহায্য নেওয়া হয়। বিভিন্ন সরবরাহকারী, যেমন- টাটা, সেইল ইত্যাদির কাছে ইস্পাত সামগ্রীও ইতিমধ্যে সংগৃহীত হতে থাকে। কিন্তু ডিজাইনমাফিক সামগ্রী না পাওয়ায় অনেক অসুবিধের সৃষ্টি হয়।

এই দপ্তর বা জেলা প্রশাসনের কাছে কোনও বার্জ বা পনটুল না থাকায় এক বিরাট সমস্যার মুখে পড়তে হয়। কিন্তু সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্র্যান্সপোর্ট কোম্পানীর সাহায্যে এই অসুবিধেও দূর হয়। শেষ পর্যন্ত ২২শে ডিসেম্বর কচুবেড়িয়া ও লট নং ৮-এ ওই বার্জ বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বসানোর সময় অবশ্য ৮নং লটের ১নং জেটিতে, ডুবন্ত অবস্থায় পুরনো পাতা রেল লাইনের জন্য বসানো যাচ্ছিল না। ডুবুরি নামিয়ে ওই লাইন কেটে সরিয়ে দেওয়ার পর সে সমস্যাও মিটে যায়। অর্থাৎ একের পর এক সমস্যার মোকাবিলা করতে করতে অবশেষে এই কাজ সমাপ্ত হয়।

অতএব সাগর মেলায় যাওয়া এখন আর তীর্থযাত্রীদের কাছে তেমন সমস্যা নয়।

তবে এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলা দরকার। সেটি হল এই পুণ্য স্নানকে ঘিরে যে সমস্ত কুসংস্কার আছে সেগুলির উপর একটু আলোকপাত করা। আগে, ইচ্ছামৃত্যু ও সন্তান বিসর্জন ছিল এই উৎসবের অঙ্গ। অনেক তীর্থযাত্রী স্ব-ইচ্ছায় মৃত্যু বরণ করত। তারা সন্তানকে ছুঁড়ে ফেলত সাগরের জলে। হাঙর ও কুমিরের মুখে।

সাগরসঙ্গমে গিয়ে ইচ্ছামৃত্যু, সন্তানকে সঙ্গমস্থলে নিক্ষেপ করার ঘটনা চলে আসছিল সগর রাজার ৬০ হাজার পুত্রের শাপে মৃত্যু ও গঙ্গার স্পর্শে আত্মার মুক্তির অলৌকিক ঘটনার প্রচারের পর। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে, সাগর সঙ্গমে তীর্থযাত্রীদের মধ্যে সাগরের সন্তান বিসর্জনের ঘটনা প্রথম জানা গেল ১৮০১ সালে। তারপর ১৮১৫ সালে, হ্যামিলটন সাহেবের গেজেট থেকে। তারও পরে ১৮৬২ সালে উইলসনের প্রতিবেদন থেকে; এ ছাড়া আমাদের জানা আছে, সে সময়ের দু'জন বাঙালি লেখক বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে "প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একদিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল।.... পর্তুগীজ ও অন্যান্য নাবিক দস্যুদের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল। ....যাত্রীরা ভয়ে ওষ্ঠাগত প্রাণ..... পুরুষেরা নিঃশব্দে দুর্গানাম জপ করিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকেরা সুর তুলিয়া বিবিধ শব্দ বিন্যাসে কাঁদিতে লাগিলেন। একটি স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন করিয়া আসিয়াছিল। ছেলে জলে দিয়া আর তুলিতে পারে নাই,—

সেই কেবল কাঁদিল না।" এবং রবীন্দ্রনাথ লিখলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'দেবতার গ্রাস'-এ ('চল তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে')। অবশ্য এঁরা ছাড়াও আরও দু'জনের লেখায় এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন ইংরেজ প্রতিবেদক উইলকিনস ও হান্টার। এছাড়া ১৯৮৯ সালে এফ. ই. পার্গিটার-এর লেখায় তো পাওয়াই গেল। ১৮০১ সালের প্রতিবেদনে জানা যায়, সে বছর সাগরে ২৩ ব্যক্তি স্ব-ইচ্ছায় সাগরে নিজেদের বিসর্জন দিয়ে তাঁদের আত্মার মুক্তি ঘটাতে চেয়েছিলেন। এই পাপমোচন বা আত্মবলিদান কিংবা সাগরে সন্তান বিসর্জন, সাগর থেকে পাওয়া আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভের জন্য নয়, কেবলমাত্র প্রতিজ্ঞা পালনের জন্যই এই অমানবিক রীতি পালন। আর কুসংস্কার থেকে প্রাপ্ত এই অজ্ঞানতাই ছিল তখনকার তীর্থযাত্রীদের ধারণা। এমন ধারণার বশবর্তী হয়েই পুত্রহীনা স্ত্রীলোক দেবতার কাছে মানত করত তার প্রথম সন্তানের জন্ম হলে তাকে সে সাগরে বিসর্জন (উৎসর্গ) করবে। এই বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল তখন, যে, সন্তানহীনার প্রথম সন্তান হলে দেবতাকে সে উৎসর্গ করবে। আর তাহলেই সে অধিক সন্তানের জননী হবে। কালক্রমে চেতনার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার দূর হওয়ার ফলে এ ধরনের রীতি আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায়।

যাই হোক, এ ধরনের কুসংস্কার ও ভয়ংকর রীতি বন্ধ হলেও মানুষের সমাগম কিন্তু বন্ধ হয়নি সাগরমেলায়। বছর বছর অগণিত, লক্ষ লক্ষ মানুষ

এসেছে। কিন্তু কবে থেকে এই মানুষের সমাগম! মনে হয়, কপিল ঋষির সময় থেকেই এই মেলায় মানুষের আগমন। কপিল ঋষি অবশ্য কোন সময়ের তা বলা শক্ত। এ বিষয়ে নানান মতান্তর আছে। তবে এটা জানা যায়, বুদ্ধ জন্মাবার অনেক আগে ও বৈদিক যুগের পরে কপিলের আগমন। কপিলের উল্লেখ পাওয়া যায় গীতা, রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণাদিতে। গঙ্গাসাগর মেলায় কপিলের নামে একটি আশ্রমও আছে। এবং সেখানে কপিলের মূর্তিও আছে। মূল আশ্রমটি অবশ্য সমুদ্র গ্রাস করে নেয়। তারই আদলে পরে এটি তৈরি। ইংরেজ আমলে এই মন্দির চার চারবার সমুদ্রের আগ্রাসী থাবায় তলিয়ে গেছে। তবে সে সময়ে (১৮৬২) আশ্রমের সামনে একটা বট গাছ ছিল। যার নিচে ছিল রাম ও হনুমানের মূর্তি। তীর্থ যাত্রীরা এসে অনেকেই আশ্রমের দেওয়ালে নাম লিখত, আর প্রার্থনা জানাত কপিলের উদ্দেশে- এক খণ্ড ইটের বা মাটির ঢেলা সামনের গাছের ডালে ঝুলিয়ে। এই ঝুলিয়ে রাখার মধ্যে দিয়ে তীর্থযাত্রীদের নিবেদন ছিল- স্বাস্থ্য, আর্থিক সমৃদ্ধি, অথবা তাদের সন্তান সন্ততির জন্ম বা অন্য কোনও মনোস্কামনা। যদি তাদের মনোস্কামনা পূর্ণ হয় তবে তারা দেবতার উদ্দেশে কিছু দান করবে।

এইচ. এইচ. উইলসনের কথায়, "Behind the temple was a small excavation termed Sitakund, filied with fresh water, of which the pilgrim was allowed to sip a small quantity, on paying a fee to the manager of the temple. This reservoir was probably filled from the tank, and kept full by the Contrivances of mendicants, who persuaded the people that it was a perpetual miracle, being Constantly full for the use of the temple"*

গাজি সাহেবের মেলা

মে মাসের মাঝামাঝি থেকে অর্থাৎ ১৫ই মে থেকে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ক্যানিং লাইনের বাঁশড়া স্টেশন সংলগ্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয় গাজি সাহেবের মেলা। এই মেলা উপলক্ষে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই গাজি সাহেবের সমাধিস্থলে আসেন। এখানে হিন্দুরা মিষ্টি ও পাঁঠা নৈবেদ্য হিসেবে দেয় আর মুসলমানরা মিষ্টির সঙ্গে মুরগি উপহার বা নৈবেদ্য হিসেবে দেয়। গাজি সাহেবের পুজো দেয় সবাই এ অঞ্চলে, রোগ মুক্তি ও বাঘের হাত থেকে বাঁচার আশায়।

গাজি সাহেব এ অঞ্চলে বিখ্যাত পীর বলে পরিচিত। তাঁর সম্পর্কে অনেক অলৌকিক কীর্তি শোনা যায়। সে কাহিনী নিম্নরূপ।

*H.H.Wilson, Essays on the Religion of the Hindus (1862 Vol II)

মোবারক গাজি নামে এক ফকির ক্যানিং লাইনের বাঁশড়ায় এসে বসবাস শুরু করেন। বাঁশড়া ছিল গভীর জঙ্গল, বন্য জন্তু ভরা। ওই বনেই গাজি সাহেব সবসময়ই বাঘের পিঠে সওয়াড হয়ে ঘুরতেন।

একবার ওই অঞ্চলের জমিদার সে বছরের রাজস্ব দিতে অক্ষম হওয়ায় সম্রাট কুলি খাঁ-র আদেশে গ্রেপ্তাব হন এবং তাঁকে মুর্শিদাবাদে ধরে আনা হয়। ছেলে গ্রেপ্তার হওয়ায় জমিদারের মা ছেলের মুক্তিব জন্য মোবাবক গাজির সাহায্য চান। ফকির মোবারক গাজি তাঁকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। এবং সম্রাট কুলি খাঁকে স্বপ্ন দেখালেন। সম্রাট স্বপ্ন দেখলেন, মোবাবক গাজিকে বন্য পশুর দল ঘিরে রয়েছে। পশুরা বলছে ফকির হচ্ছেন জঙ্গলের রাজা। যে বাজস্ব বাকি আছে জমিদারের, তা দেওয়া হবে জঙ্গলের ভেতর পোঁতা তার দৌলতখানা থেকে। জানালেন সম্রাটকে, জমিদারকে মুক্ত করে দিতে। আদেশ অমান্য করলে ভুগতে হবে সম্রাটকেই।

সম্রাটের ঘুম ভেঙে গেল। এবং প্রথমবার না হলেও দ্বিতীয় বারের স্বপ্নের বিষয়টি মনে পড়ায় তিনি জমিদারকে মুক্ত করে দিলেন। মুক্ত করে সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিলেন তাঁকে মোবারক গাজির দৌলত কোথায় লুকোনো আছে তা খুঁজে বার করতে হবে। খুঁজে পেলে সেগুলি অবিলম্বে কুলি খাঁর কোষাগারে জমা দিতে হবে। জমিদার মুক্ত হয়ে ফিরে মাকে সব জানাল। জমিদারের মা সঙ্গে সঙ্গে গাজি সাহেবকে গিয়ে সব বলায়, গাজি সাহেব গুপ্তধনের হদিশ দিলেন। বললেন, মাটি খুঁড়ে সব তুলে নেওয়ার জন্য এবং বলেই তিনি অদৃশ্য হলেন। পরদিন জমিদার মাটি খুঁড়ে দৌলত পেয়ে সে দৌলতের অংশ নিয়ে গিয়ে সম্রাটের রাজস্ব মিটিয়ে দিলেন। বাকি অংশ নিজের জমিদারি সিন্দুকে জমা পড়ল। গাজির প্রতি শ্রদ্ধায় জমিদার বাঁশড়াতে একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন। গাজি সাহেবের একটি বাড়িও তৈরির ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু গাজি সাহেব জমিদাবকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, তিনি ফকির। কাঠুরেদের বন্ধু। জঙ্গলে বাস করাই তাঁর পছন্দ, ওসব মসজিদ বা বাড়ি নয়। স্বপ্নাদেশ পেয়ে জমিদার গ্রামের মানুষকে হুকুম দিলেন, এখন থেকে প্রতি গ্রামে গাজিসাহেবের মূর্তিসহ স্থান নির্মাণ করতে হবে। তিনি বনের ও পশুদেরও রাজা। সেই থেকে সুন্দরবনের গ্রামগুলিতে গাজিসাহেবের মূর্তি দেখা যায়। আর বাঁশড়াতে প্রতি বছরই শুরু হয় গাজি সাহেবের মেলা।

পাঠান যুগের পতনের পর মোবারক গাজির নাম এতটাই ছড়িয়ে পড়ে যে পরবর্তীকালে একদল নতুন ফকির এই জেলায় তাঁদের কাজ শুরুর আগে নিজেদের পরিচয় দিতেন মোবারক গাজির সন্তান ও বংশজ অ্যাখ্যা দিয়ে। এদের জীবিকা নির্বাহ হত কাঠুরে, মৌলে বা মাছ ধরতে যাওয়া নৌকার আরোহীগণের দেওয়া নৈবেদ্য থেকে। " A member of Fakirs, who call themselves

descendants of Mobrah Ghazi, gain their livelihood by the offerings made by wood-cutters & boatmen in return for their services in protecting them from the attacks of tigers."

মানিক পীরের মেলা

মানিক পীরের মেলাও একই রকম ধর্মীয় মেলা। দক্ষিণের লাইনে মল্লিকপুর স্টেশনের কাছে এই মেলা বসে। এই জমায়েতে বেশির ভাগ মুসলমানরাই এসে জড়ো হয়। এরা মানিক পীরের উদ্দেশে মুরগি উৎসর্গ করে এবং ওখানেই রান্না করে আহার পর্ব সারে।

পীর গোরাচাঁদের মেলা

বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া গ্রাম। স্থানীয় মানুষের মতে, হাড়োয়া নামটি এসেছে, গোরাচাঁদ নামে একজন মুসলমান পীরের হাড় থেকে। এখানে তাঁর কবর আছে। বাংলা ফাল্গুন এবং ইংরেজি ফেব্রুয়ারি মাসে এই পীরের স্মরণে এখানে বাৎসরিক একটি মেলা বসে। প্রচলিত আছে যে, আজ থেকে সাতশ' বছর আগে তিনি এখানে বাস করতেন। লোক পরম্পরায় জানা যায় যে, পীর গোরাচাঁদ প্রথমে বালিগুাতে এসেছিলেন। বিদ্যাধরীর নদীর তীরে থাকতেন এবং পরে হাড়োয়ায় তিনি দেহ রাখেন। অলৌকিক এই পীরের স্মরণে তাই সুন্দরবনের উত্তরে প্রতিবছরই চলে এই মেলা।

এ ছাড়া সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে ছোট ও বড নানান ধরনের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। যেমন মথুরাপুর থানার অন্তগর্ত বড়াশি গ্রামে এপ্রিল মাসে বসে নন্দা মেলা, কুলপি থানার অধীনে কাঁটাবেলায় মে মাসে মেলা শুরু হয় বিশালাক্ষী দেবীর। মন্দিরবাজারে এপ্রিল মাসে হয় কেশবেশ্বর মেলা ইত্যাদি; প্রধানত বর্ষা ছাড়া অন্য সব ঋতুতেই মেলা বসে।

মেলা ছাড়াও সুন্দরবন অঞ্চলে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন উৎসব দেখা যায়। এর মধ্যে শীতলা পুজো উপলক্ষে গোসাবার মালো ও রাজবংশী-পাড়ায় দেখা যায় শীতলার জাগরণ উৎসব। দুর্গোৎসব তো বিভিন্ন গ্রামে সাধ্যমতো প্রতিবছরই হয়। এছাড়া নানান লোক উৎসবের ছোঁয়ায় সুন্দরবন প্রতিনিয়ত প্রাণের স্পর্শে জেগে ওঠে। ভাটিয়ালি, বাউল, লোকনৃত্য পরিবেশিত হয়। পরিবেশিত হয় জেলেদের জীবন নিয়ে লোকনৃত্য। মনসার ভাসান নিয়ে পালা উৎসব। এরই ভেতরে সুন্দরবনের নিজস্ব এক উৎসব **'নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা'** ও দুর্গোৎসবের অঙ্গ হিসেবে **'প্রতিমা ভাসান উৎসব'**।

বাইচ প্রতিযোগিতার উৎসব দেখা যায় ইছামতী নদীতে। ইছামতীর নদীর পূর্ব পাড়ে বাংলাদেশ। এপারে হিঙ্গল গঞ্জ। এরই মাঝে ঢেউয়ের মাথায় নদীর বুকে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা। সরু বাইচে থাকে ১২জন। ১১ জনের হাতে থাকে ২২ টি বৈঠা। এই বাইশ বৈঠার ঘায়ে শুরু হয় প্রতিযোগিতা। দর্শক

হিসেবে হাজার হাজার মানুষ নদীর পাড়ে সামিল হয় এই প্রতিযোগিতা দেখতে। তুমুল উত্তেজনা ও প্রচণ্ড উদ্দীপনার মধ্যে শান্ত ইচ্ছামতীও যেন তখন উত্তাল হয়ে ওঠে। নৌকা বাইচের প্রতিযোগী যারা তারা আসে বীরের বেশে।

বাইচ প্রতিযোগিতার প্রতিযোগিরা বৈঠার ঘায়ে নদীর জল ছিন্ন ভিন্ন করে গান গাইতে গাইতে প্রতিযোগিতায় সামিল হয়। তাদের সমবেত শারীর ক্রিয়ার অভিব্যক্তির সঙ্গে থাকে ওই গান। আর গানেব ভেতরে থাকে বিভিন্ন বিষয়। কখনও ধান কাটার গান, কখনও ধান ভানার গান আবার কখনও বা পাট কাটা বা মাটি কাটার গান। এই বাইচ প্রতিযোগিতা অবশ্য সুন্দরবনে নতুন নয়। প্রতাপাদিত্য, চাঁদ রায়, ঈশা খাঁ-র আমলেও অবিভক্ত সুন্দববনে এই বাইচ প্রতিযোগিতা হত। অবশ্য সে সব নৌকাগুলি ছিল পঞ্চাশ-ষাট হাত লম্বা এবং তাতে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশজন দাঁড়ি-মাঝি থাকত।

নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা ছাড়াও সুন্দরবনের প্রতিমা ভাসান উৎসবের কথা আগেই বলেছি। এই উৎসব বিজয়া দশমীর ভাসানের সঙ্গে সংস্পৃক্ত। ভাসানের দিন প্রতিমাসহ নৌকাগুলি রায়মঙ্গল নদীর উপর আস্তে আস্তে চারদিকে ঘোরে। নানা জায়গার নানান মূর্তি এসে জড়ো হয় দুপুর থেকেই। আর দু'ধারে সেই দৃশ্য দেখার জন্য হাজার হাজার লোক উৎসুক চোখে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাসান হয়ে গেলে পরে যে যার বিষণ্ণ মনে ফিরে যায়। কামনা করে আবার পবের বছরে এখনই উৎসবে তারা হাজির থাকতে পারে।

এই অনুষ্ঠানে, যেহেতু বাংলাদেশের সীমান্ত কাছে, তাই এদিন বাংলা দেশের প্রতিমাসহ কাছাকাছি সীমান্ত গ্রাম থেকে বসন্তপুরের পাশের নদী ধরে অনেক বাংলাদেশী নৌকাও চলে আসে। একসঙ্গে ভাসান উৎসবে মনের আদান প্রদান করে।

১০

সুন্দরবনের মাটির প্রকৃতি, বৃষ্টিপাত, ভূমিক্ষয় ও নদীবাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ

মাটির প্রকৃতি

সুন্দর বনের মাটি প্রধানত কাদা মিশ্রিত এবং নোনা। এই মাটিতে চারটে ভাগে শ্রেণীভুক্ত করা যায়। **ক) কাদাযুক্ত মাটি (মাটিয়াল) খ) লোম মাটি (দোঁয়াশ) গ) স্যাণ্ডি বা বালি মাটি (বালিয়া) এবং ঘ) নুন মাটি (নোনা)**

(ক) মাটিয়াল আবার তিনভাগে বিভক্ত। **১. কালে মাটিয়াল ২. রাঙা মাটিয়াল এবং ৩. ঝাঁজরা মাটিয়াল**

কালো মাটিয়াল খুবই উর্বর। সব রকম শস্য জন্মাতে পারে। **রাঙা মাটিয়াল** লালচে রঙের। গ্রীষ্মে এই মাটি ফাটে এবং বর্ষায় ফাটা গর্তগুলো ডোবে। শীতের ঋতুতে ধানের পক্ষে সুবিধেজনক এই মাটি। **ঝাঁজরা মাটিয়াল** অন্য মাটির তুলনায় নিকৃষ্ট। কালচে রঙের এবং সহজে শুকনো হয়।

(খ) দোঁয়াশ মাটি কাদা এবং বালির সংমিশ্রণ। রবি ও আখ চাষের জন্য এ-মাটি উপযোগী।

(গ) বালিয়া বা বেলে মাটিতে বালির অংশ মাটির চেয়ে বেশি এমন জমিতে তামাক, আলু, আউশ ও মুগ হয়।

(ঘ) নোনা জমি মূলত ভেজা এবং শস্য উৎপাদনের পক্ষে উপযোগী নয়।

বৃষ্টিপাত

সুন্দরবনে গড়পড়তা বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৬২৫ মি.মি (৬৪ ইঞ্চি)। কোনও কোনও অস্বাভাবিক বছরে এই পরিমাণের মাত্রা ২০০০ মি.মি (৮০ ইঞ্চি)ও ছাড়িয়ে যায়। আবার কখনও কখনও এই মাত্রা নেমে ১৩০০ মি.মি. (৫২ ইঞ্চি) তে দাঁড়ায়।

সাধারণত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু নেমে আসে ৮ই জুন এবং ফিরে যায় ১০ই অক্টোবর। ১২৪ দিনের বর্ষা মরশুমে প্রায় ৫৩ দিনেই বার্ষিক বৃষ্টিপাতের শতকরা ৭৩.২ ভাগ বৃষ্টি হয়ে যায়। বর্ষা মরশুমে দৈনিক সর্বাধিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩০০ মি.মি (১২ ইঞ্চি)। ১৯০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পরপর চারদিনের একনাগাড়ে বৃষ্টিতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮০০ মি: মি: (৩২

ইঞ্চি)। সুন্দরবন অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের নমুনা নিচের সারনিতে দেওয়া হল:

মাস	গড়পড়তা ইঞ্চি	বৃষ্টিপাত মিঃমিঃ	মাসিক বৃষ্টিপাতের শতকড়া ভাগ	বৃষ্টির দিনের গড়পড়তা সংখ্যা
জানুয়ারি	০.২২	৫.৫৯	০.৩	০.৪৯
ফেব্রুয়ারি	০.৭৫	১৯.০৫	১.২	০.৪৫
মার্চ	১.৩৭	৩৪.৮০	২.১	১.৭৮
এপ্রিল	২.৪৮	৬৩.০০	৩.৯	১.৭৩
মে	৪.৯৭	১২৬.০০	৭.৮	৪.৯৮
জুন	১০.২৪	২৬০.১০	১৬.০	১১.৫৫
জুলাই	১৪.১২	৩৫৮.৬৫	২২.১	১৫.২৭
অগাস্ট	১২.৮৪	৩২৬.১৪	২০.১	১৩.৫৫
সেপ্টেম্বর	৯.৫৮	২৪৩.৩১	১৫.০	১২.২৬
অক্টোবর	৫.১৪	১৩০.৬০	৮.০	৬.৩৮
নভেম্বর	২.০৩	৫১.৫৬	৩.২	২.০৫
ডিসেম্বর	০.২৪	৬.০৯	০.৪	০.৫০
মোট	৬৩.৯৮	১৬২৫.০০	১০০.০০	৭১

তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা

এই অঞ্চলের সর্বাধিক (মে মাস) ও সর্বনিম্ন (জানুয়ারি মাস) তাপমাত্রা হল ৩২০ সেন্টিগ্রেড (৯০° ফারেন হাইড) এবং ১৫.৭° সেন্টিগ্রেড (৬০° ফারেনহাইড ফেব্রুয়ারি প্রথম থেকেই এই তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করে এবং অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে নামতে শুরু করে। মার্চ মাসের মাঝামাঝি দক্ষিণা বাতাস বইতে শুরু করে। আর এপ্রিল ও মে মাসে কালবৈশাখী শুরু হয়।

সাইক্লোন

গ্রীক শব্দ, সাইক্রোন থেকে 'সাইক্লোন' শব্দটির উৎপত্তি। এর অর্থ এক কথায় **'সর্প কুণ্ডলী'**। বঙ্গোপসাগর এবং আরব সাগরের ক্রান্তীয় মণ্ডলের ঝড়ের প্রকোপ দেখে হেনরি পেডিংটন এরকম নাম দিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন যে সমস্ত রাজ্যগুলোর উপর দিয়ে ঝড়ের দাপট দেখা যায় তার উৎপত্তিস্থল বঙ্গোপসাগর। একটি পূর্ণাকৃতি ঘূর্ণিঝড়ের আয়তন ১৫০ থেকে ১০০০ কি.মি আড়াআড়ি ও ১০ থেকে ১৭ কি.মি পর্যন্ত উচুঁ। ঝড়ের কেন্দ্র অঞ্চলকে বলা হয় 'চোখ'।

সাইক্লোন বা ঝড় দেখা দেওয়ার কারনেই হল উত্তপ্ত বাতাসের উপর ভেজা বাতাসের প্রাদুর্ভাব। আর এপ্রিলের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত, যতক্ষণ দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু সাগরের ওপর দিয়ে বেশি অথবা কম, যেভাবেই হোক না কেন বইতে থাকবে তখনই এই সাইক্লোন বা ঝড় ওঠার সম্ভাবনা থাকে। এই সাইক্লোনিক ঝড় যতক্ষণ না তীব্র আকার ধারণ করে ততক্ষণ পর্যন্ত সে তার প্রভাব ফেলতে থাকে। অক্টোবর মাসের সাইক্লোন খুব ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এই সময়ে সুন্দরবনের বঙ্গোপসাগর এলাকায় ঝড়ের হাওয়া ও তীব্র চাপ থাকার জন্য নৌ-যানের চলাচল খুবই শক্ত হয়ে পড়ে।

সুন্দরবনের কোনও কোনও ঘূর্ণিবাত্যা অনেকটা অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়লেও তার প্রতিমাত্রা থাকে দুর্বল; কিন্তু কোনও কোনও ঘূর্ণিবাত্যা ছোট্ট অঞ্চল জুড়ে সীমাবদ্ধ থাকলেও তার প্রতিমাত্রা থাকে প্রচণ্ড।

বাতাসের প্রচণ্ড বেগের কারণেই জলস্ফীতি ঘটে। ঘূর্ণিবাত্যা বা টরনেডো সাধারণ জোয়াবকে জোয়ারের ঢেউয়ে পরিণত করে। এবং সেই জোয়ারের ঢেউ ঠিক সে সময়েই উপকূলকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। কোটাল বা উচুঁ-জোয়ারের সময় যদি সেই জোয়ারের ঢেউ উপকূল ভাগে আঘাত করে বা জোয়ারের অব্যবহিত পরেই যদি ঘূর্ণিবাত্যা সংগঠিত হয় তা হলে এই ঝড়ো ঢেউ বিধ্বংসকারী পরিণতি নিয়ে আসে। নিম্ন উপকূল প্লাবিত হয়। মুহূর্তের মধ্যে দশ, কুড়ি এমনকি তিরিশফুট উপর দিয়ে উচুঁ-জোয়ার জলের স্তর পৌঁছে যায়। স্মরণাতীত কালের মধ্যে ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসের ঘূর্ণিঝড়ই এ-পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে সবচেয়ে ভয়ংকর আকার নিয়ে এসেছিল। সাগরদ্বীপে এই ঝড়ের সর্বাধিক বাতাসের বেগ রেকর্ড করা হয়েছিল ঘন্টায় ১৬৫ কি.মি (১০০ মাইল) এবং সর্বাধিক জল-সমতলের উচ্চতা ছিল প্রায় ৩.৫ মিটার (১১.৫ ফুট)।

নভেম্বর থেকে মে মাসের মধ্যে বঙ্গোপসাগরের নিম্নভাগে নিম্নচাপ ঘনীভূত হয়। যে সময়ে সুন্দরবনের উপকূলভাগে ঘূর্ণিবাত্যা আছড়ে পড়ে তা হল জুন মাস থেকে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত। এর ভেতরে অক্টোবর মাসটা হল সবচেয়ে ভয়ংকর —যখন দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু পশ্চাৎপসারণ করে ও উত্তর-পশ্চিম বায়ু বইতে শুরু করে।

বেশির ভাগ ঘূর্ণিঝড়ই গড়পড়তা যে গতিতে উপকূলভাগ অতিক্রম করে তার হেরফের ঘটে ঘন্টায় ২৫ কি.মি থেকে ৭৫ কি.মি এর মধ্যে। কেবল ১৯০৭ থেকে ১৯৬৬ সালের এই ৬০ বছর ধরে ঘন্টায় ২৫ কি.মি. বেগমাত্রায় প্রায় ১০৮ টি সাইক্লোন সুন্দরবনের উপকূলভাগ অতিক্রম করেছে। গতিবেগ ও মাপ ভিত্তিক হিসেব অনুযায়ী নিচের সারণি থেকে বাতাসের একটি চিত্র পাওয়া যাবে:

সারণি/১

বাতাসের গতি (প্রতি ঘন্টায় কি. মিতে)	আবির্ভাবের সংখ্যা	শতকরা হার
২৫	৩১	২৯
৫০	৩০	২৮
৭৫	২৫	২৩
১০০	১১	১০
১২৫	১০	৯.৯
১৫০	১	০.১
১৭৫		
	১০৮	১০০

মাস হিসে আর একটি সারণিতে এই পরিসংখ্যানটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এভাবে·

সারণি/২

মাস	আবির্ভাবের সংখ্যা	শতকবা হার
জানুয়ারি	০	০
ফেব্রুয়ারি	০	০
মার্চ	০	০
এপ্রিল	০	০
মে	৪	৪
জুন	৯	৮
জুলাই	২৮	২৬
আগস্ট	৩১	২৯
সেপ্টেম্বর	১৬	১৪.৫
অক্টোবর	১৭	১৫.৫
নভেম্বর	৩	৩
ডিসেম্বর	০	০
	১০৮	১০০

এ-সমস্ত ঘূর্ণিবাত্যাই পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্রোপকূলের ক্রমাম্বয়িক ভূমিক্ষয়ের অন্যতম

কারণ। ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপের উত্তেজনা নির্ধারিত হয়। বাতাসের গতিবেগের উপর। বিশ্ব আবহ সংস্থা (W. M. O)-র অনুসরণে ভারতীয় আবহ দপ্তর বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ার সময়ে বাতাসের গতি অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড়ের উত্তেজনাকে এভাবে শ্রেণীবিভাগ করেছে:

নিম্নচাপ অঞ্চল □১৭ নট পর্যন্ত [ঘন্টায় ৩২ কি. মি]
নিম্নচাপ □১৭-২৭ নট [ঘন্টায় ৩২-৫০ কি. মি]
গভীর নিম্নচাপ □২৮-৩৩ নট [ঘন্টায় ৫১-৬০ কি. মি]
ঘূর্ণিঝড় □৩৪-৪৭ নট [ঘন্টায় ৬১-৮৯ কি. মি]
তীব্র ঘূর্ণিঝড় □ ৪৮-৬৩ নট (ঘন্টায় ৯০-১১৯ কি.মি)
তীব্র ঘূর্ণিঝড় ও □ ৬৪ নটের উপর (ঘন্টায় ১২০ কি. মি)
প্রবল ঝঞ্ঝা

অবিভক্ত বাংলার কয়েকটি স্লাইকোন

১৭৩৮-৩৯ সালে Captain Baird Smith লিখিত একটি পত্রিকায় এক ভয়ংকর ঘূর্ণিবাত্যার পরিচয় পাওয়া যায়। পত্রিকাটির নাম 'Gentlemen's Magazine'। Captain Smith লিখলেন, 'In the night between 11th & 12th october 1737 there happened a furious hurricane at the month of the Ganges which reached 60 leagues up the reiver. There was at the same time a violent earthquake which threw down a great many houses along the river side;"

ঝড় হুগলি নদীর উপরে ৬০ লীগ (বা ৩ মাইল) উঁচুতে পৌঁছেছিল। সেই সঙ্গে ভয়ংকর ভূ-কম্পন। ২০,০০০ জাহাজ, বজরা, মাস্তুলের জাহাজ, ডিঙি, নৌকা ইত্যাদি নৌ-যানগুলিকে দুমড়ে মুচড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। জঙ্গলের বাঘ, হরিণ, কুমির, বাঁদর ইত্যাদি বন্যজন্তু নিমেষে মরে গিয়েছিল। ৬০ টন ওজনের জাহাজগুলি ঝড়ের তাণ্ডবে উঁচু গাছের মাথা ডিঙিয়ে কয়েক মাইল দূরে গিয়ে ছিটকে পড়েছিল। স্বাভাবিক অবস্থা থেকে জলস্তর ৪০ ফুট উঁচুতে উঠেছিল।

Smith লিখেছেন, "Barks of 60 tons were blown two leagues up into land over the tops of high trees: of four Dutch ships in the river, three were lost with their man & Cargoes; 300,000 souls are said to have perished. The water rose for ty feet higher than usual in the Ganges."

১৮৬৪ সালের ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড়

১৮৬৪ সালের ভয়ংকর এই ঘূর্ণিবাত্যা বাংলার মানুষের কাছে এক আতঙ্ক হয়ে নেমে এসেছিল। এবছরের অক্টোবর মাসের চার তারিখ। বিকেলের দিকে বঙ্গোপসাগর থেকে ধীরে ধীরে উঠে এসে এই ঝড়, বাঁদিকে ঘুরে স্যাণ্ড হেডের উপরে ঘুরে রাতের দিকে সমস্ত শক্তি নিয়ে ফুঁসে উঠেছিল। পরেরদিন অর্থাৎ ৫ অক্টোবর তারপর তাণ্ডব চালায়। এই ঝড়ের তাণ্ডবে জলস্তর ৩০ ফুট পর্যন্ত উঁচুতে উঠেছিল। সাগর-দ্বীপে জমির উপরে ১৫ ফুট উঁচুতে জল প্রবাহিত হয়ে জনজীবন ধ্বংস করে দেয়। বাঁধ, বাড়ি-ঘর, ধানের গোলা, কৃষিজমি সবই জলের অতলে তলিয়ে যায়। হাজার হাজার মানুষ ও বন্যজন্তু মারা যায়। ডায়মণ্ডহারবারে এই জলস্তর ছিল ১১ ফুট। আর রাস্তায় ছিল যত্রতত্র মৃত দেহের সার। ঝড়ের প্রকোপ এত প্রবল ও ভয়ংকর ছিল যে হুগলি নদীবক্ষে কলকাতা বন্দরের জাহাজগুলির নোঙর ছিঁড়ে দুমড়ে মুচড়ে যায়। ১০ টি জাহাজ নদীতে ডুবে যায়। প্রায় ১৫০ টির মতো ভেসে চলে যায়। 'দ্য গোবিন্দ পুর' নামের একটি ১২০০ টনের জাহাজকে উল্টে দেয় এবং নদীবক্ষে নিমেষে জাহাজদুটি ডুবে যায়। বঙ্কিমচন্দ্র সে সময়ে ডায়মণ্ডহাববার মহকুমার ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে ঝড়ের পরে এসেছিলেন পুনর্গঠনের কাজে। কিন্তু অবস্থা দেখে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

১৮৬৭ সালের সাইক্লোন

১ লা নভেম্বর ১৮৬৭ সালে সুন্দরবনে আবার এক ঘূর্নিঝড় দেখা গেল। এবার ঝড়ের তাণ্ডব ছিল পূর্বদিকে বেশি। বসির হাটের দিকে ইস্থামতীর উপর। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলি ছিল বারুইপুর, ডায়মণ্ডহাববাব, বসিরহাট এবং গোবরডাঙা। ঝড়ে প্রচণ্ড ধ্বংস হয়েছিল ক্যানিং বন্দরের। ক্যানিং রেলস্টেশন, মালগুদাম ঘর, হোটেল সব উড়ে গিয়েছিল।

এ দুটি বছরের ঘূর্নিঝড় ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে সুন্দরবনে যে সাইক্লোনের খবর পাওয়া যায় তা হল ১৮২৩, ১৮৩৩ ইত্যাদি বছরগুলিতে।

স্বাধীনতার পরেও বিভক্ত বাংলার সুন্দরবনে ঝড় ঝঞ্ঝা এখনও নিত্যসঙ্গী। প্রায় প্রতি বছর অল্প বিস্তর সাইক্লোন দেখা দেয়। জীবন ও সম্পদহানির ঘটনাও ঘটে। স্বাধীনতার পরে যে ভয়ংকর ঘূর্নিঝড়গুলি আসে সে বছরগুলি হল ১৯৫৬, ১৯৫৯, ১৯৬৮, ১৯৭০, ১৯৮৫, ১৯৮৮, ১৯৯৩ ও ১৯৯৫।

ভূমিক্ষয়

নদী আপন বেগে চলতে চলতে কখনও এপাড় ভাঙে, কখনও বা ওপাড়। আবার কোথাও কোথাও চর সৃষ্টি করে (Mendaring of river)। জোয়ারের উল্টোস্রোতে নদীগুলি যে পলি বহন করে আনে, কোথাও কোথাও নদীর গতি প্রায় শূন্য হওয়ায় এই পলি জমা হয়ে সমস্যা তৈরি করে। কেননা ভাঁটার টানে এই পলি সামান্যই সরে যায় : কিন্তু সম্পূর্ণভাবে কখনওই সরে না। এভাবে

সুন্দরবনের নদী ও খাঁড়ির তলদেশ পলি পড়ে উঁচু হতে থাকায় নদীখাত সরতে সরতে বাঁধের দিকে চলে আসে। এবং এভাবেই বাঁধের ক্ষতি করে।

আগেই বলা হয়েছে, সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকা একসময়ে অনাবাদী ছিল। সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সুন্দরবনে জমিদার, লাটদার বা চকদারেরা সুষমভাবে জনবসতি গড়ে তোলেনি। ফলে অনেক এলাকা অনাবাদী রয়ে গেছে। অনেক অঞ্চলে দেরিতে আবাদ শুরু হয়েছে। আবাদের অভাবে অনেক জায়গার নদীর ভাঙনও তীব্র হয়েছে। কেননা আগে আবাদ শুরু করায় আবাদি অঞ্চলে মাটি যত শক্ত হয়েছে, অনাবাদী এলাকায় মাটি শক্ত না হওয়ায় অল্প প্রতিরোধেই সে ভূমি ভাঙনের কবলে পড়েছে।

গোসাবা, বাসন্তী, কুলতলি ও ক্যানিংয়ের একটা অংশের নদীগুলি আকারে ছোট। ছোট হলেও কিন্তু সমস্যা সঙ্কুল। এসব নদীগুলিতে ক্রমশ চরা পড়ে যাচ্ছে। নদীর জল ধাবণের ক্ষমতা কম হওয়ার ভাঙন সর্বগ্রাসী হচ্ছে। গত কয়েক বছরে গোসাবার কুমিরমারি মৌজা ও রাঙাবেলিয়ার দু'পাশে বিদ্যাধরী ও গোমর নদী প্রায় ২ কি.মি করে প্রায় ৪ কি.মি ভূমিগ্রাস করেছে। ক্যানিং, গোসাবা, বাসন্তী, কুলতলিতে নদীর জলধারণ ক্ষমতা যেমন কমে গিয়ে চর সৃষ্টি করেছে, তেমনই এই সমস্যার ফলেই ওদিকে কুমিরমারি রাঙাবেলিয়া অঞ্চলে বিদ্যাধরী গোমর নদী ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। দুর্গাদোয়ানি নদী দেখতে ছোট, কিন্তু অনেক গভীর ও খরস্রোতা। এই নদীর পাড় প্রতিনিয়তই ভাঙছে। ফলে দু'পাশের বিরাজনগর, সোনাগাঁ ইত্যাদি মৌজা আজ দারুণ সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে। নদীর গর্ভে ঢুকে যাচ্ছে এ-সমস্ত মৌজার জমি। হোগল নদীও ইদানিং ক্রমশ ভাঙছে। ফলে আক্রান্ত হচ্ছে চণ্ডীপুর ও কামারপাড়ার মৌজাগুলি। ছোট নদীর ভাঙন যেভাবে হয় বড় নদীর ভাঙনের প্রকৃতি আবার তার থেকে অন্যরকম। তাছাড়া আবহাওয়াও নদীর প্রকৃতির তফাত ঘটাতে বড় একটা ভূমিকা নিচ্ছে। দক্ষিণের বাতাস যখন বাড়ে তখন নদীগুলিও বিপজ্জনক আকার ধারণ করে। ক্রমাগত বড় বড় ঢেউ বাতাসের টানে তীরভূমিতে আছড়ে পড়ায় নদীতীরের ভূমিক্ষয় বেড়েই চলেছে।

পাথর প্রতিমার একদিকে সাগর। সাগরের বিপজ্জনক ঢেউয়ের আঘাতে আক্রান্ত হচ্ছে গোবর্ধনপুর, সীতারামপুর, উত্তর-সুরেন্দ্রগঞ্জ ও পশ্চিম-সুরেন্দ্রগঞ্জের মৌজাগুলি। মার্চ মাস থেকে জুন মাসের মধ্যে এসব এলাকায় নদীগুলি ভয়ংকর আকার ধারণ করে। ভাঙনের আকার সবচেয়ে তীব্র সাগর থানা কচুবেরিয়ার পূর্বদিকে। মুড়িগঙ্গা নদী এখানে বিশাল। সাগর দ্বীপের ওদিকে বেগুয়াগালি অঞ্চলে ভাঙনও তাই তীব্র হয়েছে।

সুন্দরবনের ভূমিক্ষয়ের অন্যতম কারণ দুটি। **(১) ক্রমাগত ঢেউয়ের ধাক্কায় পাড় ভেঙে যাওয়া এবং নদী বেশি চওড়া হওয়া। (২) শতকরা ৮০ ভাগ নদীর বেগ।** আসলে ভূমিক্ষয় সমস্যায় শুধু নদীর উপরিতলই নয়, নদীগর্ভের

ব্যাপারেও এখন থেকে খোঁজ খবর নেওয়া দরকার। জানা দরকার কী কী পরিবর্তন সেখানে ঘটছে। এ ব্যাপারে সমুদ্রের মোহনা থেকেই পর্যবেক্ষণ শুরু করা দরকার। এ জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন **ডেটা সংগ্রহ ও ডেটা ব্যাঙ্ক** তৈরি করা। আর একটা কথা, নদীকে প্রবাহিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট জায়গা দিতে হবে। রিঙ বাঁধ তৈরি করে পিছিয়ে যেতে হবে। তবে পিছিয়ে যাওয়ার পথে নানান বাধা আসবে। সে বাধাগুলি অবশ্য অতিক্রম করতে হবে। আর একটি বিষয়ও দেখা দরকার। তা হল বাঁধ তৈরির সময় প্রয়োজনীয় ঢালের সমতা যাতে রক্ষা করা যায়।

সুন্দরবনের ভূমিক্ষয়ে সাইক্লোন বা ঝড়ের প্রভাবও তীব্র। প্রচণ্ড সামুদ্রিক ঝড়ে জলোচ্ছ্বাস উঁচু হয়ে বাঁধের গায়ে ভেঙে পড়ে বা উপচে পড়ে বাঁধ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। অথচ প্রাকৃতিক এই দুর্যোগকে উপেক্ষা করার সাধ্য মানুষের নেই। প্রাকৃতিক এই দুর্যোগ প্রকৃতির নিয়মেই ঘটবে। কিন্তু পাশাপাশি চলবে এই দুর্যোগের হাত থেকে জনজীবন ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ। কেননা ঝড় ও ঝঞ্ঝা এখানে নিত্য সঙ্গী। প্রায় প্রতি বছরই এজন্য কৃষিজমির ক্ষতি হয়। বাঁধ ভেঙে নদীর নোনা জল জমিতে ঢুকে পড়ে। জমি এখানে এক-ফসলি। একটাই মাত্র ধান হয় এবং তা হল আমন। এই ধান চাষের জন্য বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করতে হয়। কেননা সমুদ্রের কাছাকাছি থাকায় এবং দিনে দু'দুবার জোয়ার ভাঁটার কারণে সব নদীর জলই এখানে নোনা। এই নোনা জল রাশির হাত থেকে কৃষি জমিকে রক্ষা করার জন্যই নদী পাড় ঘেঁষে বাঁধা হয়েছে প্রধানত মাটির নদী-বাঁধ। এই সব বাঁধের প্রয়োজন এ-কারণে যে সুন্দরবনের জমির লেভেল পার্শ্বস্থ নদীর বঙ্গোপসাগরের জোয়ারের লেভেল (High tyde Level) অনেক নিচু হওয়ার কারণে।

স্বাধীনতার আগে এখানকার ভূস্বামী বা জমিদাররা নোনাজলের হাত থেকে কৃষিজমিকে বাঁচাবার জন্যই বাঁধের ব্যবস্থা করেছিলেন। কেননা এ-সমস্ত বাঁধগুলিই ছিল সুন্দরবনবাসীর জীবন-মরণের সমস্যা। ১৯৫৪ সালে জমিদারি প্রথা বিলোপ হয় এবং সুন্দরবনের মোট ১০২ টি দ্বীপের ৫৪ টি দ্বীপমালায় অবস্থিত বসবাসকারী মানুষের ওই জনজীবন, কৃষিজ জমি ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে ৩৫০০ কিলোমিটার নদী-বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণের ভার স্বাভাবিক ভাবেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপর ন্যস্ত হয়। ১৯৬০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগ এই দায়িত্ব হাতে পায়। কিন্তু ওই সময় বাঁধগুলি উপযুক্ত মানের ছিল না। ছিল খুবই দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু। ফলে জলোচ্ছ্বাস ও ঝড়ে ওইসব নদী-বাঁধ প্রায়ই ভেঙে যেত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের ওইসব নদী-বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আসায় নদীর নোনা জল থেকে দ্বীপের জমি রক্ষার্থে ওই সব বাঁধের সংস্কার শুরু হয়। সঙ্গে আরও দুটি কার্যসূচি হাতে নেওয়া হয়। তা হল দ্বীপের জমা জল বের করে দেওয়া ও ভূমিক্ষয় নিবারণ।

সমুদ্র তীরবর্তী এবং হুগলি, সপ্তমুখী, ঠাকুরাণ, মাতলা, বিদ্যা, রায়মঙ্গল

প্রভৃতি দক্ষিণ বাহী বড় নদীগুলির মোহনায় অবস্থিত নদীবাঁধগুলি প্রবল জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসে ও ঘূর্ণিঝড়ে স্বাভাবিকভাবে প্রতিবছরই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কোথায়ও কোথায়ও বাঁধ ভেঙে নোনা জল ঢুকে জমি ও শস্যাদির প্রচুর ক্ষতি করে। সেজন্য ওই নদী বাঁধগুলি ইট অথবা ইট-সিমেন্ট দিয়ে বিশেষভাবে তৈরি 'ব্লক/পাথর' দিয়ে বাঁধানোর পরিকল্পনা করা হয়, যাতে দিনে দু'বার জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসের ধাক্কা সহ্য করতে পারে। সেই মতো কাজও শুরু হয়। কিন্তু এ কাজ ব্যয় সাপেক্ষ হওয়ায় সব জায়গায় নদী বাঁধে ওই পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। তাই বেশিরভাগ নদী বাঁধগুলিই মাটির তৈরি। কিন্তু এরা সবসময় সেভাবে জলোচ্ছ্বাসের চাপ সহ্য করতে পারে না। ফলে মাঝে মাঝেই ভেঙে পড়ে।

সরকারি পরিকল্পনা

১৯৭৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সুন্দরবনের উন্নয়নের জন্য সেচ ও জলপথ বিভাগের অধীনে একটি বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনাই হল Urgent Development of Sundarban । এই পরিকল্পনার আওতায় বিভিন্ন কাজের কথা বলা হয়েছে।

[ক] **স্বল্প মেয়াদী কর্মসূচী**

■ প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসে বাঁধগুলি যাতে ভেঙে না পড়ে তার জন্য প্রতি বছরই বাঁধগুলি মজবুত ও শক্ত করা।

■ নদীর ধারের মাটির বাঁধের ঢালে (Slope) 'ইট' অথবা ইট সিমেন্টে তৈরি 'ব্লক' দিয়ে ঢাল বাঁধানো।

■ সুন্দরবনের মোট নিকাশী স্লুইসের সংখ্যা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা মিলিয়ে ৮২৫। এ-সমস্ত স্লুইস দ্বীপগুলির অতিরিক্ত জমা বৃষ্টির জল বের করে দেয়।

■ ভূমিক্ষয় রোধে 'অ্যান্টি - ইরোশন' -এর কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। এই কাজে বিভিন্ন জায়গায় 'পর্কোপাইন কেজ' ও 'সসেজ ওয়ার্ক'-এর জায়গায় এবং আরও এ ধরনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

[খ] **দীর্ঘমেয়াদী কার্যসূচী**

■ সুন্দরবন ডেল্টা প্রোজেক্ট -এর পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সমুদ্রের কাছাকাছি নদীর মোহনাকে বাঁধ দিয়ে আটকে জোয়ারের বিপুল জলস্রোতের হাত থেকে সুন্দরবনকে বাঁচাবার কথা ভাবা হচ্ছে।

■ সুন্দরবনের বেলাভূমি ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করা এবং নদীর মোহনা ও সমুদ্রোপকূলে কাজের জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও মেদিনীপুর সমুদ্রোপকূল অঞ্চলের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ের এই পরিকল্পনা বর্তমানে পরীক্ষাধীন।

আজকের ন্দন □ সমস্যা ও উন্নয়ন

সুন্দরবন বদলাচ্ছে। প্রায় ২০০ বছর আগে মরিসন সাহেব যে সুন্দরবনের জরিপ শুরু করেছিলেন প্রায় দুশো বছরের ব্যবধানে সেই সুন্দরবন এখন অনেক পরিবর্তিত। মোট ১০২ টি দ্বীপের মধ্যে ৫৪ টি দ্বীপের মানুষের [যে হেতু এই দ্বীপগুলিতেই মানুষের বসবাস] আদমসুমারির পরিসংখ্যান অনুযায়ী জনসংখ্যা ইতিমধ্যেই ৩৫ লক্ষের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এই বনাঞ্চল একটি জেলারই অধীনে ছিল। কিন্তু প্রশাসনিক সুবিধার জন্য এই জেলাকে উত্তর ও দক্ষিণ এই দু'ভাগে বিভক্ত করায় সুন্দরবন এখন দুটি জেলার অধীন — উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা। উত্তরে রয়েছে বসিরহাট মহকুমা (গোসাবা বাদে) এবং দক্ষিণে ডায়মণ্ডহারবাব ও বসিরহাটের গোসাবা মহকুমা।

অতীতে যে সুন্দরবন খাড়িমণ্ডল, বারোভাটি, বাঘ্রতটি মণ্ডল ও আঠারো ভাটির দেশ নামে পরিচিত ছিল, যে দক্ষিণাংশে ইউরোপীয়রা যোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাদের অস্ত্রসজ্জিত তরীগুলিকে নিয়ে, সমুদ্র পাড়ের ২৪ টি পরগনার সুন্দরবনের অসংখ্য নদীমোহনা, জোয়ার জল ওঠা নামার খাল, খাড়ি ও দ্বীপসমূহের ভিতরে অপ্রতিরোধ্য বিচরণ করেছে, বিগত কয়েক দশকের পরিবর্তনে সেই সুন্দরবনই এখন মনে প্রাণে আধুনিক প্রযুক্তি ও জীবনযাত্রার দিকে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ঘটে চলেছে এক ভয়ংকর বিপর্যয়। খুবই নিঃশব্দে যে-প্রকৃতি উজাড় করে সাজিয়েছিল সুন্দরবনকে, এখন সে ধুঁকছে। বসতি ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে দিনের পর দিন,মানুষের আগমন যেমন বাড়ছে তেমনই বনজ সম্পদ ও সমুদ্র সম্পদও খুব দ্রুত নিঃশেষিত করার দিকে এগিয়ে চলেছে। তার উপর যুক্ত হয়েছে নানান জঞ্জাল। শহরের পরিত্যক্ত নোংরা ও কল-কারখানার নানান রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ হুগলি নদীর উপরিভাগ থেকে প্রবাহিত হয়ে এসে নিম্নবাহী নদীগুলির যুক্ত হয়ে জলকে কলুষিত করছে। এতে জল-চর প্রাণীর জীবনে নেমে এসেছে বিপদ। বিপদ শুধু জল-চর প্রাণীরই নয়, বিপদ এ-অঞ্চলের বন্য-প্রাণী, বনজ সম্পদ এমনকি মানুষেরও।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এসব সমস্যা নিয়ে আমরা কতটা ভাবছি। কতটাই বা নিজেদের দায়িত্ব পালন করছি। অথচ এ অঞ্চলের ব্যাপক পরিবেশ যদি বিজ্ঞান সম্মতভাবে সংরক্ষণ করা যায়, তাহলে প্রাকৃতিক বিপদ থেকে মুক্তি শুধু নয় — অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকেও মানুষ প্রচণ্ড লাভবান হতে পারে।

সুন্দরবনের বনাঞ্চল থেকে মধু সংগ্রহ, নদী-নালা ও সমুদ্র থেকে ধরা কাঁকড়া, চিংড়ি এবং নানান প্রজাতির মাছ বিদেশে রপ্তানি করে রাজ্য সরকার বছরে কোটি কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা অর্জন করেন। কিন্তু কেবল নিলেই চলবে না, দিতেও হবে কিছু। সে জন্য আজ ভাবতে হচ্ছে, যে বিপুল টাকার বিদেশী মুদ্রা আয় করা হয় তার একাংশ এই বনাঞ্চলের পেছনে খরচ করা যায় কিনা। ভাবনা নয়, এই প্রস্তাব রূপায়ণের ব্যাপারে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে সুন্দরবনের জন্য একটি পৃথক পরিকল্পনা গ্রহণ করার। এই পরিকল্পনায়, সুন্দরবনের ভৌগলিক ও আর্থ সামাজিক দিক বিচার -বিবেচনা করে ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের উপর জোর দিতে হবে। সুন্দরবনের সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে কেন্দ্রের কাছে তুলে ধরতে হবে এবং এ অঞ্চলের জন্য একটি পৃথক মাষ্টার-প্ল্যান তৈরি করতে হবে। সুন্দরবনের সমস্যা যেমন জাতীয় সমস্যা বলে ধরতে হবে, তেমনই সুন্দরবনের জলপথকেও জাতীয় জলপথ হিসাবে ঘোষণা করা প্রয়োজন। রাজ্য সরকারের হাতে হয়তো সে পরিমাণ অর্থ নেই। কিন্তু সেজন্য এ-ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকেই। পাশে থাকবে রাজ্য সরকার। তবে যেই থাকুন, আবারও বলা দরকার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা নিয়ে না এগোলে এ-কাজে সফল হওয়া কষ্ট।

সুন্দরবনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচী

সুন্দরবনকে বাঁচাতে এবং ভবিষ্যত উন্নতির লক্ষ্যে এখনই কতগুলি বিষয়ের উপর কর্মসূচী গ্রহণ করা দরকার। সেগুলি হল :

১] পরিবেশ সংরক্ষণ

২] ভূমিক্ষয় ও ভাঙন রোধে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা

৩] উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে সার্ভে

৪] নদীর গতিবিধির তথ্যাদি সংরক্ষণ ও ডেটা ব্যাঙ্ক তৈরি

৫] পরিবেশের সঙ্গে সমতা রেখে ছোট ছোট কুটির শিল্প গঠন

৬] শিক্ষার বিস্তার ও আরও শিক্ষাকেন্দ্র নির্মাণ

৭] পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলা ও পুরনো পর্যটন কেন্দ্রগুলির পুনর্বিন্যাস

৮] সৌরশক্তিকে সুন্দরবনের গ্রামীণ জীবনে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা

৯] মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি

১০] গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করা

পরিবেশ সংরক্ষণ

সুন্দরবনের পরিবেশ সংরক্ষণে প্রথমেই দূষণের কথা মনে রাখা দরকার। এই

দূষণ দু'রকমের, প্রাকৃতিক দূষণ ও মনুষ্যকৃত দূষণ। প্রাকৃতিক দূষণ হয় মূলত নদীতীরের ভূমিক্ষয় থেকে। নদী তীরবর্তী কৃষি ভূমি ও ধৌত মৃৎকণাও এর সঙ্গে মিশে থাকে এবং কৃষিকাজে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক পদার্থ ব্যবহার করায় সেগুলি ধৌত অবস্থায় মাটির সঙ্গে নদী পাড়ে চলে যায়। পরে পাড় ভাঙন বা ভূমিক্ষয়ের মাধ্যমে তা জলে মেশে।

মনুষ্যকৃত দূষণ শুধু মানুষের দেহ নির্গত বর্জ্য পদার্থই নয়, আধুনিক শিল্প নগরীর নানান বর্জ্য জলপথে চলে আসে নিম্নবাহী নদী গর্ভে। নদীর জল দূষিত হয়ে পড়ে।

এই দূষণের ব্যাপারে এই মুহূর্তেই ভাবনা চিন্তা করা দরকার। দবকার জঙ্গলে এসে জঙ্গলের নিয়ম মানা। সুন্দরবন অঞ্চলের অনেক জায়গায়ই দেখেছি (যেমন সজনেখালি, সুধন্যখালি, নেতি ধোপানি, ছোট মোল্লাখালি, ভগবতপুর কুমির প্রকল্প, জম্বুদ্বীপ, কলস দ্বীপ) পর্যটকরা শীতের মরশুমে বেড়াতে এসে লঞ্চে মাইক, টেপ রেকর্ডার ইত্যাদি বিপুল বেগে চালিয়ে দেয়। মুহূর্তে জঙ্গলের নীরবতা উধাও। শহরের কলকাকলি ও মনুষ্যকূলের দৌরাত্মে থমথমে গম্ভীর জঙ্গল তখন হরিশার হাট। এগুলি নিয়ম করে বন্ধ হওয়া দরকার। না হলে শব্দ দূষণের কবলে পড়ে জঙ্গলের পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হবে অচিরেই।

ভূমিক্ষয় ও ভাঙন রোধে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা

চিরাচরিত কৃত্রিম প্রথায় নদীকূলের ভাঙন রোধে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। যতক্ষণ না অর্থ পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ প্রাকৃতিক উপায়ে নদীর দু'পাড়ে লাগাতে হবে ম্যানগ্রোভ। এইসব লবণাম্বুজ উদ্ভিদ শুধু পরিবেশের অবনতিই রোধ করবে না নদীতীরের ভূমিক্ষয় রোধেও সাহায্য করবে। এ ছাড়া বাঁধ কেটে ভেড়ি গুলিতে জল ঢোকানো বন্ধ করতে হবে।

উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে সার্ভে

সম্প্রতি কলকাতা বন্দরের গবেষণা বিভাগ উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে ফারাক্কা থেকে সাগর পর্যন্ত অঞ্চলের ভূ-সংস্থানগত অবস্থা বিশ্লেষণের একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। দেরাদুনের **ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ রিমোট সেনসিঙ [IIRS]** এই প্রকল্পের প্রধান উপদেষ্টা ও তাঁদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে। উপগ্রহ চিত্রের দূর-অবধারণা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে [Remote Sensing Technique] পলি সংবহনের প্রকৃতি ও পলিভারের পরিমাণ নির্ণয়ও এই প্রকল্পের অঙ্গীভূত। সুন্দরবনের ব্যাপারেও এমন দূর অবধারণা প্রক্রিয়ার ব্যবহার দরকার।

নদীর গতিবিধির তথ্যাদি সংরক্ষণ ও ডেটা ব্যাঙ্ক তৈরি

আগেই বলা হয়েছে নদীর উপরিভাগে কেবল নয়, নদীর তল দেশের খবরাখবরও

বিস্তারিতভাবে সংগ্রহ করতে হবে। আর এসব খবর সহগ্রহ করে, ডেটা ব্যাঙ্ক তৈরি করতে হবে। কেননা প্রয়োজন মতো কাজের ক্ষেত্রে, তখন এই ডেটা ব্যাঙ্কই সঠিক তথ্য দিয়ে সাহায্য করবে।

পরিবেশের সঙ্গে সমতা বজায় রেখে কুটির শিল্প গঠন

কাঠ সুন্দরবনের মূল্যবান সম্পদ। কেওড়া ও গেঁওয়া বৃক্ষ সুন্দরবনে প্রচুর পরিমাণে হয়। এ সমস্ত বৃক্ষ বয়স্ক হলে তখন এগুলি নিয়ে এসে তা থেকে প্যাকিং বাক্স তৈবি হতে পারে। এ জন্য গ্রামে গ্রামে ছোট শিল্প গড়ে তোলা যায়।

এ ছাড়া বঙ্গোপসাগরে নানা ধরনের শামুক পাওয়া যায়। এগুলি সংগ্রহ করে সুন্দরবনের নানা জায়গায় চূন শিল্পের কারখানা গড়ে তোলা যায়। এই ব্যবসার জন্য স্বল্প মূলধন হলেই চলবে। একটা বা দুটো নৌকা, কয়লা ও জ্বালানী কাঠ এবং পাঁচ-ছ'জনের শ্রম হলেই একটা চূন শিল্পের লগ্নী ব্যবসা হতে পারে। এই চূন সুড়কি বা কয়লার ঘেসের সঙ্গে মিশিয়ে গ্রামাঞ্চলে যেমন বাড়ি তৈরি হতে পারে তেমনই এই চূন জমির লবনাক্ত হ্রাস করার কাজেও লাগানো যেতে পারে। এই সঙ্গে মধুর কৃত্রিম চাষও করা যেতে পারে।

শিক্ষাব বিস্তার ও শিক্ষাকেন্দ্র নির্মাণ

সুন্দরবনে জঙ্গল হাসিলের কাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খৃষ্টান পাদরিরা সুন্দরবন অঞ্চলে শিক্ষা প্রচারের কাজ শুরু করেন। এই শিক্ষা প্রচারের পাশাপাশি

ছিল ধর্মপ্রচার। ১৮২৩ সালে এ উদ্দেশ্যে এঁরা টালিগঞ্জ, গড়িয়া ও বালিগঞ্জ অঞ্চলে প্রথম ৭টি বিদ্যালয় গড়ে তোলেন। ঠিক এরই কাছাকাছি প্রায় বছর তিনেক আগে ১৮২০ সালে এই পাদরিরা বারুইপুরে একটি স্কুল স্থাপন করে এর মাধ্যমে শিক্ষাদান ও ধর্মপ্রচারের কাজ আরম্ভ করেন। ১৮৩৩ সালে মগরাহাট, ক্যানিং, বাসন্তী, লক্ষীকান্তপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বেশ কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলেন এরা। উদ্দেশ্য এসব অঞ্চলের দুঃস্থ শিশুদের লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করা।

১৮৬৪ সালে রোমান ক্যাথলিক মিশন সুন্দরবন অঞ্চলে শিক্ষা ও ধর্মচারের উদ্দেশ্যে কইখালিতে মাটির উপাসনা গৃহ তৈরি করে। ব্যাপটিস্ট মিশন সুন্দরবন অঞ্চলে ১৮২৯ সাল থেকে শিক্ষাবিস্তারের কাজ শুরু করেছিল। এদের সব থেকে উল্লেখযোগ্য কাজ কিছু প্রাথমিক ও আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন। বিষ্ণুপুর, লক্ষীকান্তপুর ছিল এদের প্রধান কেন্দ্র। কাজেই দেখা যাচ্ছে শ্বাপদ-সংকুল এই সুন্দরবনে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই খৃষ্টান পাদরি, রোমান ক্যাথলিক মিশন ও ব্যাপটিস্ট মিশন শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা নিয়েছিলেন।

১৯১১ সালের এক সমীক্ষায় জানা যায়, ওই সময়ে সমগ্র ২৪ পরগনা জেলায় সাক্ষর লোকের সংখ্যা ছিল ৩,০০,৮১৮ জন। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ১২ জন। এর ভেতরে সুন্দরবন অঞ্চলে সাক্ষর ছিল শতকরা ২ থেকে ৩ জনের মধ্যে। কেননা জঙ্গল হাসিল করতে যারা এসেছিল তারা সবাইই ছিল নিরক্ষর ও জনমজুর। যে ২/৩ জন লিখতে পড়তে জানত তারা সবাইই ছিল পুরুষ। মেয়েদের লেখাপড়ার প্রচলন ছিল না। ১৯১৩ সালের এক সমীক্ষা থেকে সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যালয়গুলির ছাত্রসংখ্যার নমুনা আমরা পেতে পারি :

বারুইপুর উচ্চ বিদ্যালয় □ ২৫৪ জন
ডায়মণ্ডহারবার উচ্চ বিদ্যালয় □ ২৮০ জন
হটুগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় □ ১২৮ জন
জয়নগর উচ্চ বিদ্যালয় □ ৩৯৩ জন
মজিলপুর উচ্চ বিদ্যালয় □ ৩৩৪ জন

১৯১৩ সালের এই সমীক্ষা থেকে জানা যায়, সে সময়ে সুন্দরবনের সমস্ত ব্লক বা থানায় এ ধরনের স্কুল ছিল না। ১৯৭১ সালের আদমসুমারির সমীক্ষায় দেখা যায় সুন্দরবনের সর্ব দক্ষিণের থানাগুলিতে অনেক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল তৈরি হয়েছে। তবে কলেজ সে অনুপাতে কিছুই হয়নি। নিচের সারণিতে এই পরিসংখ্যান দেখানো হল :

থানা	প্রাথমিক	মাধ্যমিক	মহাবিদ্যালয়
গোসাবা	৬২	২৪	-
হিঙ্গলগঞ্জ	৬৩	১৭	-
সন্দেশখালি	১২৪	১২	-
মিনা খাঁ	২৮	৬	-
হাড়োয়া	৬৮	৯	-
নামখানা	৪৯	১২	-
সাগরদ্বীপ	৯৮	২৬	-
কাকদ্বীপ	১১৮	২২	১
পাথরপ্রতিমা	১৬৮	৩২	-
মোট □	৭৭৮	১৬০	১*

১৯৭১ এর পরে অবশ্য সুন্দরবনেব বিভিন্ন অঞ্চলে আরও অনেক প্রাথমিক/মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়। কিন্তু অসংখ্য স্কুলই আছে যাদের অবস্থা খুবই দুর্বিষহ। একদিকে সরকারি অনুদানের অভাব ও অন্যদিকে বিদ্যালয় ভবনের জরাজীর্ণ অবস্থা এবং প্রয়োজনের তুলনায় কম শিক্ষক — ফলে উপযুক্ত শিক্ষা তো দূরের কথা, এ সব স্কুলগুলি চলানোই এখন এক প্রধান সমস্যা।

সুন্দরবনের গ্রামে-গঞ্জে অবশ্য নন্‌-ফরমাল কিছু কিছু শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু হয়েছে, কিন্তু উপযুক্ত দেখা-শোনা ও অর্থনৈতিক কারণে সেগুলিও বন্ধ হওয়ার মুখে। এসব স্কুল মূলত ক্লাব-ভিত্তিক। ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেক জায়গায়ই দেখেছি এগুলি চলছে, কিন্তু ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দু'একজন ব্যক্তির উদ্যোগ এত বড় সমস্যায় সিন্ধুতে বারি বিন্দু মাত্র। অতএব এদিকেও নজর দিলে এ অঞ্চলে শিশুর কাছে শৈশব থেকেই পড়াশোনার দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

এরই পাশাপাশি সুন্দরবনে কারিগরি মহাবিদ্যালয় থাকা উচিত। তবে এসব অঞ্চলের ছাত্ররাও কারিগরি বিদ্যায় সরাসরি এখানেই অংশ নিতে পাববে। বিভিন্ন গঞ্জে, যারা শহরের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে অনেক দূরের দ্বীপে বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করেন তাদের কাছে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে শিক্ষা-সংস্কৃতির জগতকে উন্মুক্ত করে দিতে হবে। এই গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই নানান সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলা যায় ৫৪ টি দ্বীপের সুন্দরবনের

* পরে পাঠানখালিতে ১ টি মহাবিদ্যালয় গড়ে তোলা হয়।

পর্যটন কেন্দ্র

পরিবেশের সঙ্গে সমতা রেখে সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও অনেক পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা যায়। বিভিন্ন স্পটে পর্যটন রিসর্ট তৈরি করে পর্যটকদের উপহার দেওয়া যায়, জল-জঙ্গলের এক মনোরম পরিবেশ। সেই সঙ্গে প্রতি রিসর্ট কেন্দ্রে থাকবে উপযুক্ত মানের সুসজ্জিত জলযান। যেগুলি প্রতি কেন্দ্রের পর্যটকদের নিয়ে সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থান ঘুরিয়ে দেখাবে। যেমন বঙ্গোপসাগরের প্রায় কোল ঘেঁসে কলস, হ্যালিডে ও বুলচেরি দ্বীপ। তার বিপরীতে উত্তর বা পশ্চিম সুরেন্দ্রগঞ্জে গড়ে তোলা যায় এমনই এক পর্যটন কেন্দ্র। সজনেখালিতে এমন রিসর্ট আছে। কিন্তু উপেক্ষা ও অবহেলায় তা মৃতপ্রায়। কাছাকাছি বাঘনায় নতুন কেন্দ্র হতে পারে। হতে পারে, নামখানা, লুথিয়ান দ্বীপ, বাঘডাঙায়।

সুন্দরবনের সৌরশক্তি

একদা স্যার ডানিয়েল হ্যামিলটন তাঁর গোসাবা এস্টেটে জেনারেটর চালিয়ে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেছিলেন। হ্যামিলটনের রাজত্বের প্রায় ১০০ বছর পর গোসাবার ব্যবসায়ী সমিতি জেনারেটরের মাধ্যমে গোসাবার বিভিন্ন দোকান ও বাড়িতে
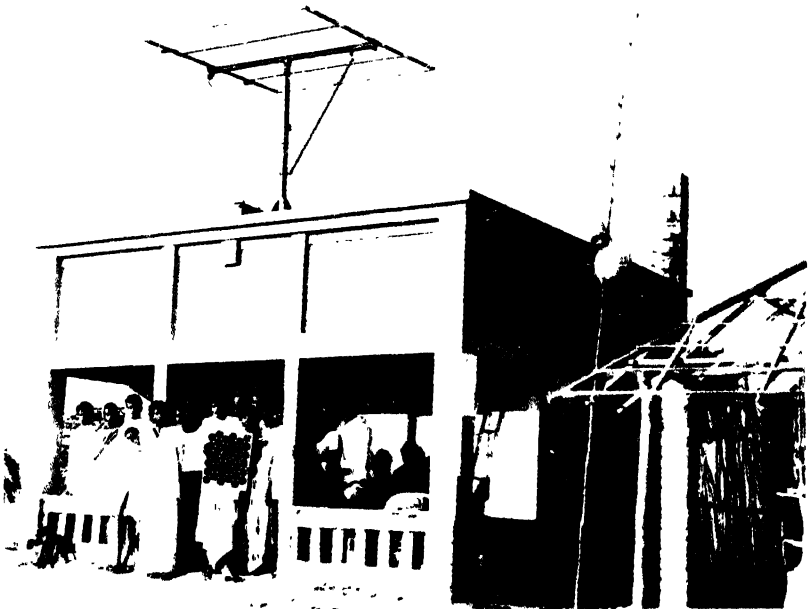
লাইন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু ইউনিট প্রতি মূল্য খুব চড়া হতে থাকায় পরে সে ব্যবস্থা স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু জেনারেটর ছাড়া যে সুন্দরবনে আলো জ্বালানো যায় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সৌরশক্তি। কেননা হাইটেনশন লাইনের

মাধ্যমে সুন্দরবনে ৫৪ টি দ্বীপের জন বসতিতে আলো পৌঁছানো প্রাকৃতিক কারণেই সম্ভব নয়। অতএব ভরসা সৌরশক্তি। এই সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সুন্দররবনের বিভিন্ন জায়গায় (১০০ টি পয়েন্টে) ইদানিং বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভগবতপুরের একটি ক্লাবে দেখলাম সৌরশক্তির সাহায্যে টি.ভি. চলছে। স্থানীয় ছেলেরা রাত জেগে বিশ্বকাপ ফুটবল দেখছে। সৌরশক্তিকে কাজে লাগানো হয়েছে কইখালি আশ্রমে। সজনেখালিতেও জঙ্গলের পাশে একটা দুটো আলো জ্বলতে দেখেছি সৌরশক্তির সাহায্যে। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে খরচ থাকলেও মনে হয় বহুলাংশে এর ব্যবহারে খরচ কমতে পারে। এবং এ-ব্যাপারে সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে। গ্রামে গ্রামে এর ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামীণ জীবনের উন্নতি যে ঘটবে তাতে সন্দেহ নেই।

মানুষের সচেতত্তা বৃদ্ধি

কেবলমাত্র সরকারি মুখাপেক্ষি হয়ে না থেকে মনে হয় আজ দিন এসেছে, সবাই মিলে চিন্তা করার। সুন্দরবনকে বাঁচাতে ও এর অর্থনৈতিক বনিয়াদ দৃঢ় করতে ব্যক্তি মানুষ থেকে বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানকে আরও নানাভাবে এই ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। সাধারণ মানুষকে বোঝাতে হবে। তাদের কর্মসংস্থানের নানা উপায় নিয়ে ভাবতে হবে। ভাবতে হবে ও বদলাতে হবে পুরনো মানসিকতার। তবেই আগামীদিনের সুন্দরবন হয়ে উঠবে উন্নততর।

মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি

সুন্দরবনের ফ্লোরা-ফনা, তার বনজ সম্পদ ও সমুদ্র-সম্পদ বাঁচাতে হলে আজ চাই উন্নত গবেষণা। যেমন সাগরের বামনখালিতে অবস্থিত সুষমাদেবী চৌধুরানী মেরিন রিসার্চ ইনস্টিটিউট আছে। সুন্দরবনের জল ও অরণ্যসম্পদ নিয়ে এরা গবেষণায় নিমগ্ন আছেন। যেমন আছে কলকাতা ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, যেমন আছে নরেন্দ্রেপুর রামকৃষ্ণ মিশনের লোকশিক্ষা পরিষদ, যেমন আছে কইখালি রামকৃষ্ণ আশ্রম, যেমন আছে গোসাবা টেগোর সোসাইটি, এদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন ভারত সরকার ও ইউনেসকো। এ রকম আরও নানান ধরনের গবেষণা কেন্দ্র হওয়া দরকার । হলে এবং তার উপযুক্ত প্রয়োগে সুন্দরবন বাঁচবে, নয়তো আগামী দিনে যে তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আর আগামী দশকে পৃথিবী পড়বে একবিংশ শতাব্দিতে। সুন্দরবনেরও বয়স বাড়বে। কিন্তু সেদিকে লক্ষ না রেখে যদি শুধু অবহেলায়ই থাকে তা হলে ভারতবর্ষের এমন একটি অঞ্চল অদূর ভবিষ্যতে আবারও এক সভ্যতার সাক্ষর রেখে যে অতলে তলিয়ে যাবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

এক নজরে সুন্দরবন

সুন্দরবনের আয়তন □ ৩০৮৯ বর্গমাইল (৭৯১০ বর্গ কি.মি)
নদীনালা ও খাড়িসহ সংরক্ষিত বনাঞ্চল □ ১৬২৯ বর্গমাইল (৪১৭০ বর্গ কি.মি)
কৃষিজ ভূমি □ ১০০০ বর্গ মাইল (২৫৯০ বর্গ কি.মি)
মোট প্রান্তীয় নদী-বাঁধ □ ৩৫০০ কিলোমিটার
উত্তর ২৪-পরগনা □ প্রায় ৭৫০ কি.মি
দক্ষিণ ২৪-পরগনা □ প্রায় ২৭৫০ কি.মি
জলের উপরিতল □ ৩৬০ বর্গমাইল (৮৯১ বর্গ কি.মি)
জোয়ার-ভাটার মধ্যবর্তী স্থান □ ১০০ বর্গ মাইল (২৫৯ বর্গ কি.মি)
সীমানা □ উত্তর : ড্যাম্পিয়ার হজেস লাইন
দক্ষিণ : বঙ্গোপসাগর
পূর্ব : ইছামতি-কালিন্দী-রায়মঙ্গল নদী
পশ্চিম : হুগলি নদী
মোট স্লুইস গেট □ ৮২৫
উত্তর ২৪-পরগনা : ১৭২
দক্ষিণ ২৪-পরগনা : ৬৫৩
সুন্দরবনের মোট ব্লক সমূহ □ ১৯
উত্তর ২৪-পরগনা : ১. হিঙ্গলগঞ্জ ২. সন্দেশখালি/১
৩. সন্দেশখালি/২ ৪. হাড়োয়া
৫. মীনাখাঁ ৬. হাসনাবাদ
দক্ষিণ ২৪-পরগনা : ১. কাকদ্বীপ ২. নামখানা
৩. সাগর ৪. পাথরপ্রতিমা
৫. মথুরাপুর/১ ৬.মথুরাপুর/২
৭. কুলতলি ৮. ক্যানিং/১
৯. ক্যানিং/২ ১০. বাসন্তী
১১. গোসাবা ১২. জয়নগর/১
১৩. জয়নগর/২

সুন্দরবনের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থান

সুন্দরবনের শতকরা ৮৫% মানুষই কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষি ছাড়া অন্যান্য পেশা হল মাছ ধরা, মৎস্য পালন, মধু সংগ্রহ ও কাঠকাটা। শতকরা ৫০%

কৃষিজীবি মানুষই ভূমিহীন। শতকরা ৪৪% ভাগ মানুষ তপসিলি জাতি ও তপসিলি আদিবাসী ভুক্ত। ফলে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অংশের তুলনায় সুন্দরবন অঞ্চলে সাক্ষরতার অনুভূমিক সহ মাথা পিছু আয় খুবই কম। এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই দুর্বল এবং অধিকাংশ অঞ্চলই দুর্গম ও প্রবেশ অসাধ্য। এসব কারণেই এ অঞ্চলে বর্তমানে কিছু কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়।

প্রধান কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি প্রকল্পসমূহ

১] শতকরা ১০০% ভাগ কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রকল্প

ক) সুন্দরবন জীবমণ্ডল সংরক্ষণ প্রকল্প

খ) সুন্দরবন ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ ও পরিচালন

গ) বনসম্পদ বৃদ্ধি ও আর্থ-উন্নয়ন প্রকল্প

২] পশ্চিমবঙ্গ বনবিদ্যা প্রকল্প (বিশ্ব ব্যাঙ্ক অনুদান প্রকল্প)

৩] অঞ্চল ভিত্তিক জ্বালানী কাঠ এবং পশুখাদ্য প্রকল্প (শতকরা ৫০% ভাগ কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রকল্প)

পরিবেশের ভারসাম্যতা ও ম্যানগ্রোভের বনসৃজন

১৯৮৯-৯০ সাল থেকে, সুন্দরবন জীবমণ্ডল সংরক্ষণের জন্মলগ্ন থেকেই এর অধীনে প্রায় ৬০০০ হেক্টর এলাকায় কৃত্রিম বনসৃজনের মাধ্যমে ম্যানগ্রোভ তৈরি করা হয়েছে এবং ৭০০ হেক্টর এলাকায় করা হয়েছে অন্যান্য ধরনের উদ্ভিদ। ১৯৯৪ সালের মধ্যে যে ২৭৮৪ হেক্টর এলাকায় কৃত্রিম বনসৃজন করা হয় তার মধ্যে ২৫৮৯ হেক্টর এলাকাই ম্যানগ্রোভের আওতায় রয়েছে। ১৯৮৯ সাল থেকে আকাশ পথে সুন্দরবনের দুর্গম অঞ্চলগুলিতে ম্যানগ্রোভের বীজ ছড়ানো কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। এই কর্মসূচি হাতে নেওয়ায় ১৯৯৪ সালের মধ্যে ঠাকুরাণ চরের প্রায় ৪০০ হেক্টর জমিতে ম্যানগ্রোভ জন্ম নেয়। এবং নতুন নতুন চর জমির সন্ধান করা হয় আরও ম্যানগ্রোভ বসানোর উদ্দেশ্যে।

গবেষণা ও অনুসন্ধান

সুন্দরবন জীবমণ্ডল সংরক্ষণের অধীনে কিছু বিস্তারিত গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ১৯৭৩ ও ১৯৮২ সালে যথাক্রমে কুমির ও সামুদ্রিক কচ্ছপ (অলিভ রিড্‌লে) এর ডিম সংগ্রহ ও তাকে কৃত্রিম উপায়ে ফুটিয়ে বাচ্চা জন্মাবার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয় ভগবতপুরে। গবেষণা প্রকল্প হাতে নেওয়া হয় **নদীচর নানা জাতীয় কচ্ছপের** উপর। সজনেখালিতে কৃত্রিম উপায়ে এদের ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা তৈরির কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। **কাঁকড়ার** জন্মদান জীববিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়েও গবেষণার কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে সুন্দরবন জীবমণ্ডল সংরক্ষণের অধীনে। পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে **বন্য মেছো বেড়ালের** উপর। গবেষণা চালানো হচ্ছে অশ্বখুর

জাতীয় কাঁকড়ার উপর। বিশ্ব চিকিৎসা গবেষণায় যাদের ক্যানসারের প্রতিরোধকারী হিসেবে বলা হচ্ছে। এছাড়া আছে সুন্দরবনের দূষণ বাঁচানোর উপর নানান অনুসন্ধান ও কৃষির উন্নতি সাধন।

সুন্দরবনের জীবমণ্ডল সংরক্ষণের অধীনে একটি পাঁচ বছরের কর্মশক্তি প্রয়োগের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। এগুলি হল :

ক. জীবন্ত প্রাণী বা উদ্ভিদ সংক্রান্ত এবং অ-জীবন্ত প্রাণী বা অ-উদ্ভিদ সংক্রান্ত বিষয়ের পরস্পর সম্পর্কের উপর গবেষণা।

খ. কৃষিবিদ্যা, বনবিদ্যা ও মৎসচাষ-এর উন্নত প্রযুক্তির প্রবর্তন ও পরিচয়ের উপর গবেষণা।

গ. মাথা পিছু আয় বাড়াবার জন্য দক্ষতা-প্রশিক্ষণ।

ঘ. পরিবেশের ভারসাম্যতা রক্ষার পাশাপাশি সুন্দরবনের মানুষের জীবনধারণের উন্নতি।

এর পাশাপাশি আর একটি বিষয়েও নজর দেওয়া হয়েছে। তা হল সুন্দববনের প্রাচীন ঐতিহাসিক ও পুরাকীর্তির উদ্ভাবন।

সুন্দরবনাঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেব জন্য এক গুচ্ছ আর্থ-উন্নয়ন কর্মসূচির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলি হল : Mariculture, Acquaculture, Beekeeping, Farm-foresity, Horticulture, Distribution of Somkeless Chullah, Use of Solar Energy, Vocational training, Health & Veterinary Services.

মৎস্যপালন

সুন্দরবনের মানুষের একটি বড় অংশই মাছ ধরা ও মৎস্যচাষের সঙ্গে যুক্ত। এদের মধ্যে অনেকেই নদীর কাছাকাছি পুকুরের জোয়ার জলে মীন (ছোট চিংড়ি) ভেটকি, পারসে ইত্যাদি চাষের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সুন্দরবন জীবমণ্ডলের অধীনে সরকারি খরচে গত ৩ বছরে ৪৬টি এ-রকম পুকুর কাটা হয়। আর এই চাষ থেকে এসব অঞ্চলের প্রায় ৪৬০ টি পরিবার উপকৃত হয়।

মধু সংগ্রহ ও মৌ-চাষ

প্রতি বছর সুন্দরবনাঞ্চল থেকে গড় প্রতি ৬০,০০০ কি.গ্রাম মধু সংগ্রহ করা হয়। এবং প্রায় হাজার পরিবার এই সংগ্রহ ব্যবস্থার মধ্যে থেকে তাদের জীবনধারণ করে আছে।

মৌ-চাষ সম্প্রতি খুব জনপ্রিয় হয়েছে। সুন্দরবন জীবমণ্ডল সংরক্ষণ গত ৩ বছরে প্রায় ৮০০ মৌমাছি চাষের বাক্স এ-অঞ্চলের গ্রামবাসীদের মধ্যে বিতরণ করেছে। এই বিতরণ পদ্ধতি স্থানীয় পঞ্চায়েতের অনুমোদন সাপেক্ষে করা হয়।

মাশরুম চাষ

এই সংরক্ষণ সংস্থা গ্রামবাসীদের মধ্যে মাশরুম চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এই চাষ সম্পর্কে এই অঞ্চলের মানুষকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে এ কারণে যে ভবিষ্যতে এ-অঞ্চলের মানুষ যাতে প্রোটিন-ফুড সংগ্রহ করতে পারে এই চাষ থেকে।

ধোঁয়াহীন উনুন এবং সৌরশক্তির ব্যবহার

ধোঁয়াবিহীন উনুন এ-অঞ্চলে ক্রমশ পরিচিত হয়ে উঠছে। সুন্দরবন জীবমণ্ডল সংরক্ষণ সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে ১৪,০০০ উনুন গত পাঁচবছরে সরবরাহ করেছে।

সৌরশক্তির ব্যবহারও বাড়ছে সুন্দরবনে। এই শক্তির সাহায্যে আলো জ্বলছে

ভগবতপুর, ধঞ্চি এবং নলগড়া অঞ্চলে। এই সংরক্ষণের আওতায় প্রায় ১০০টি কেন্দ্র আছে সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে।

পেশাগত প্রশিক্ষণ

অনুপূরক আয়ের ব্যবস্থা থেকে স্ব-নির্ভর কর্মপ্রকল্প-এর প্রশিক্ষণে বর্তমানে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে অনেককেই। এবং যে যে বিষয়ে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেগুলি হল:

প্রশিক্ষণ প্রকৃতি	**প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সংখ্যা**
মৎস্যপালন	৪২
পোলট্রি	৪২
মৌচাষ	৫০
ফলচাষ	৫০

মহিলাদের ভূমিকা

সুন্দরবনের মহিলা সম্প্রদায়ের এ-অঞ্চলে এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এদের বেশিরভাগই পুরুষদের পাশাপাশি জ্বালানী-কাঠ সংগ্রহ, মাছ ধরা ও চাষ-বাস ইত্যাদি প্রথাগত পেশার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু এ সব অঞ্চলে এদেরও প্রচুর সুযোগ রয়েছে অনুপূরক আয় থেকে (Supplementary Income) উপার্জন করার। সাক্ষর মহিলাদের এজন্য এসব অঞ্চলে পাঠানো হচ্ছে ওই মহিলাদের সঙ্গে থেকে তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন উপার্জনের রাস্তায় নিয়ে আনার জন্য।

সরকারি সংস্থার পাশাপাশি সুন্দরবনের বে-সরকারি সংস্থার ভূমিকা

সুন্দরবন জীবমণ্ডল সংরক্ষণে সরকারি ব্যবস্থার পাশাপাশি অনেক বেসরকারি সংস্থাও এগিয়ে এসেছে। সুন্দরবনের বেঁচে থাকা ও সুন্দরবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যাদের ভূমিকা স্মরণীয়। এরা হল:

লোকশিক্ষা পরিষদ (নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন)
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়/সমাজ-বিজ্ঞান পরীক্ষা কেন্দ্র
বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
পশ্চিমবঙ্গ দূষণ-নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ
জু-লজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া
বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া
সুষমাদেবী মেরিন বায়োলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট (সাগরদ্বীপ)
সেন্ট্রাল সয়েল স্যালিনিটি রিসার্চ সেন্টার (ক্যানিং)

টেগোর সোসাইটি (রাঙাবেলিয়া)
রামকৃষ্ণ আশ্রম (নিমপীঠ)

সহায়ক গ্রন্থ

১. বাংলার নদনদী □ ডঃ নীহার রঞ্জন রায়
২. বাঙালীর ইতিহাস □ ডঃ নীহার রঞ্জন রায়
৩. বাঙলার লৌকিক দেবতা □ গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
৪. পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি □ বিনয় ঘোষ
৫. District Hand Book (24.parganas)
৬. Ancient India. □ Dr. R.C. Mazumder.
৭. পদবির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস □ খগেন্দ্রনাথ ভৌমিক
৮. সুন্দরবন বিচিন্তা □ মণীন্দ্রনাথ জানা
৯. Bengal District Gazetteers □ L.S.S. O' Malley
১০. সুন্দরবনের ইতিহাস □ এ.এফ.এম আবদুল জলীল (ঢাকা)
১১. আত্মীয়সভা পত্রিকা □ গিরিন দেব সম্পাদিত
১২. সেচ পত্র □ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের মুখপত্র
১৩. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম □ সুপ্রকাশ রায়
১৪. বর্তিকা □ মহাশ্বেতা দেবী সম্পাদিত
১৫. পরায়ত্ত পরগনা কথা □ মনোরঞ্জন রায়
১৬. Hand out : Sundarban Biosphere Reserve (Deptt. of Forest/Govt. of West Bengal)
১৭. Survey Report. □ Statistical Bureau /Govt. of W.B.
১৮. ২৪ পরগনার মন্দির □ অসীম মুখোপাধ্যায়
১৯. দক্ষিণ ২৪-পরগনার লোক শিল্প □ সত্যানন্দ মণ্ডল
২০. গঙ্গা □ তপোব্রত সান্যাল